মাসুদ রানা
প্রতিদ্বন্দ্বী
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুইখণ্ড একত্রে
সেবা প্রকাশনা
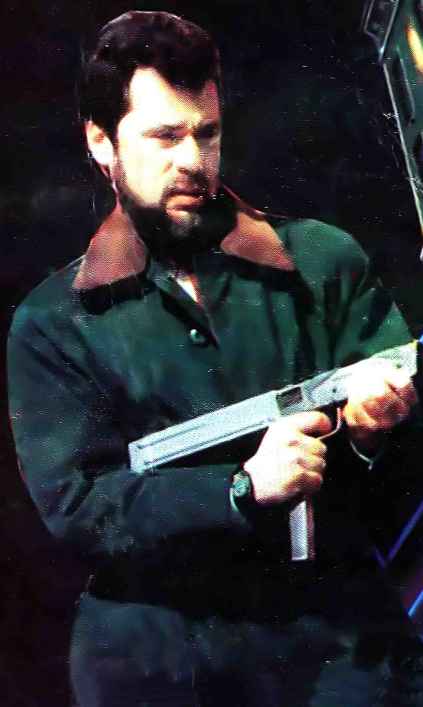
মাসুদ রানা

প্রতিদ্বন্দ্বী

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

একের পর এক আঘাত করছে দাতাকু। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে রানা।
কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বহুকষ্টে মৃত্যুর দুয়ার থেকে রেবেকাকে ফিরিয়ে এনে প্রতিজ্ঞা করল সে: আর নয়, শেষ দেখব এবার।
ভূমিকম্পের দ্বীপ কায়ুদানায় টেনে নিয়ে এল সে দাতাকুকে, পাতল মৃত্যু-ফাঁদ। শেষ বারের মত মুখোমুখি হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবন মরণ যুদ্ধে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৫৯, ৬০

প্রতিদ্বন্দ্বী ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

প্রতিদ্বন্দ্বী

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7059-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭
পঞ্চম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Web Site www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
PROTIDWANDI
Part I&II
A Thriller novel
By: Qazi Anwar Husain
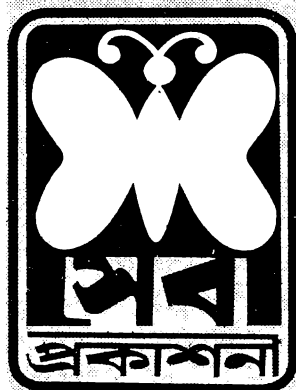
তেত্রিশ টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪১/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৬৩/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-

১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০=১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-

প্রতিদ্বন্দ্বী-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮

এক

নিজস্ব একটা দ্বীপ চাই।

ক্যারিবিয়ান সাগর পাড়ি দিচ্ছে গোল্ডেন সোয়ান। পেছন দিকে হেলে পড়েছে সূর্য। পুয়ের্টোরিকোর রাজধানী সান যোয়ান আর পঁচিশ মাইল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে নোঙর ফেলবে ওখানে গোল্ডেন সোয়ান।

রেলিঙের ওপর ঝুঁকে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গাঢ় নীল টাইটা পত পত শব্দে উড়ছে কাঁধের ওপর। আহ্, এরই নাম জীবন! জ্যামাইকায় খামার বাড়ি, ক্যারিবিয়ান সাগরের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ায় রাবার বাগান, ফ্রান্সের পল্লীতে মনোরম একটা শ্যাতো, রোমের উপকণ্ঠে একটা অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস, আর নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউয়ে রানা এজেন্সীর অফিস বিল্ডিং। আপাতত রেবেকা ও রানা মিলে হচ্ছে এই, পরে সারা দুনিয়ায় শিকড় গাড়বে ওরা।

চাই নিজস্ব একটা দ্বীপ, তবে তাতে থাকতে হবে পাহাড়; এই ছিল রেবেকার শর্ত। মার্কিন সরকারের টেন্ডার নোটিশটা চোখে পড়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পুব থেকে পশ্চিমে বিছানো আগ্নেয় পর্বতশ্রেণীর ভিতর কোথাও থাকতে হবে সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপটা। সিদ্ধান্তের পরপরই, কি অদ্ভুত যোগাযোগ, জার্মান ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় টেন্ডার নোটিশটা দেখল ওরা। স্পেসিফিকেশন, শর্ত আর নিয়মাবলীর পুস্তিকা কিনে দেখা গেল আগ্নেয় পাহাড়ই রয়েছে দ্বীপগুলোয়। সাত আটটা দ্বীপ, তিনটে বাদে সবগুলো নিলাম হবে।

পুয়ের্টোরিকোর একটা কেনাবেচা ব্যবসায় তদারককারী প্রতিষ্ঠানকে ওর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে রানা, তারাই ওর হয়ে কিনবে দ্বীপটা। দ্বীপগুলো দেখে কোন্টা ওর পছন্দ তা জানাতে হবে, তাই যাচ্ছে ও। পুয়ের্টোরিকো হয়ে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ।

সান যোয়ানে কোন কাজ ছিল না রানার। হঠাৎ পেল একটা ফোন, 'হোটেল ম্যান্ডারিনে ডিনারের নিমন্ত্রণ করছি। যে কোনদিন, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত। অবশ্যই আসা চাই। জরুরী।'

এটুকু ছাড়া আর কোন রহস্য করেনি চিত্রা। প্রথমেই নিজের নাম জানিয়েছে সে, অবশ্য তার কোন দরকার ছিল না—রানা ঠিকই বুঝতে পারত এ কণ্ঠস্বর কার।

ফোন নাম্বার পেল কোথায়, কি এমন জরুরী দরকার, এসব কিছুই জানায়নি চিত্রা। বলেছে, দেখা হলে সব বলব। আগেই শুনেছে রানা, ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস থেকে বিদায় নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ব্যবসায়ী যুবককে বিয়ে করেছে চিত্রা, বাড়ি কিনেছে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে।

রানার ডেয়ারী ফার্ম আর খামার বাড়ি থেকে কিংস্টন সত্তর মাইল দূরে। একটা মার্সিডিজ আর দুটো স্পোর্টসকার গ্যারেজে থাকলেও রাজধানীতে বড় একটা আসা হয় না ওর, তাই চিত্রার খবরও নেয়া হয়নি। এমন সময় ওর ফোন, বেশ একটু অবাকই হয়েছে রানা। সান যোয়ানে কি করছে ও?

পোর্ট থেকে বেরিয়ে সুপার মার্কেটে গেল রানা। চিত্রার জন্যে কিনল একটা দামী সেন্ট। সেন্ট কিনতে গিয়ে মনে পড়ল চিত্রার কথা, টয়োমেন ছিল ওর প্রিয় সেন্ট। কিন্তু কোথায় এখন মিত্রা?

মার্কিন জাহাজের নাবিক গিজগিজ করছে রাস্তায়। প্রায় প্রত্যেকের একটা করে হাত কোমর জড়িয়ে আছে সঙ্গিনী দ্বীপবাসিনীর। বিনা নোটিশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চুমো খাচ্ছে ওরা—তিনবার দিক পরিবর্তন করতে হলো রানাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছুতে।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই হোটেল ম্যান্ডারিনের সাত ফুট লম্বা নিগ্রো গেটম্যান মস্ত এক স্যালুট ঠুকল। সুইংডোর ঠেলে লাউঞ্জে ঢুকল রানা, ওখান থেকে রিসেপশনে। এগারোতলার একশো একত্রিশ নম্বর স্যুইটটা মাত্র খালি আছে ওর জন্যে। ছত্রিশ ইঞ্চি স্যামসোনয়েড সুটকেসটা পোর্টারকে ধরিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াল ও।

রেস্তোরাঁয় তেমন ভিড় নেই। জুক-বক্স থেকে ছড়িয়ে পড়া সুরের সাথে চিত্রার লাল কাপড়ে মোড়া পা দুটো অলস ভঙ্গিতে তাল দিচ্ছে। রানাকে দেখা মাত্র উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখটা, হাতে ধরা কফির কাপটা টেবিলে রেখে উঠতে যাচ্ছে, রানা এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরল চিত্রার। 'জানো খুকী, মাসখানেকের মধ্যে পরিচিত মুখ তোমাকেই দেখলাম,' তারপর চুরুটের প্যাকেট বের করে মুখোমুখি চেয়ারে বসল ও। 'কিন্তু একা কেন, কালো মানিক কই?'

কপালে উঠে গেল চিত্রার ভুরু। 'কালো মানিক?' তারপরই শব্দ করে খিলখিল হেসে উঠল সে। 'বুঝেছি! কালা আদমী বিয়ে করেছি জানো তাহলে? রায়ান গেছে অফিসের কাজে পোর্ট অভ স্পেনে। পরশু দিন ফিরতে পারে। তারপর তোমার খবর? শুনলাম…'

'ঠিকই শুনেছ,' চুরুট ধরাবার ফাঁকে চিত্রার দিকে একবার তাকাল রানা।

'কিন্তু তোমার মত একজন এজেন্টকে…কারণ কি?'

'জানি না,' গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা। 'জানতে চাইও না। ডাকলেও যাচ্ছি না আর। ম্যাডিসন এভিনিউয়ে রানা এজেন্সীর অফিস নিয়েছি.

ইচ্ছা করলে জয়েন করতে পারো।'

বিষম খেলো চিত্রা। 'জয়েন করব আমি? একজন ভারতীয় প্রাক্তন এজেন্টকে প্রস্তাব দিচ্ছে বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন এজেন্ট?' পরক্ষণে সরল হয়ে গেল মুখের রেখাগুলো। 'তুমি মাসুদ রানা–হ্যাঁ, কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু না, ও-জগৎ চিরকালের জন্যই ছেড়ে দিয়েছি। তবু তুমি বললে, এজন্যে অনেক ধন্যবাদ। তা দ্বীপ কিনছ যে?'

'জানলে কিভাবে?' ঠোঁট থেকে চুরুট নামাল রানা। 'ফোন নাম্বার পেলে কোত্থেকে?'

'পুয়ের্টোরিকোর কেনাবেচা ব্যবসায় তদারকী প্রতিষ্ঠানটার মালিক একজন নিগ্রো।'

'রায়ান, তোমার স্বামী?'

'হ্যাঁ,' বলল চিত্রা। 'তোমার ফোন যখন আসে, আমি অফিসেই ছিলাম।' ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত নেড়ে নিষেধ করল চিত্রা। রানাকে বলল, 'বারে গিয়ে বসব আমরা, কি বলো? তুমি আমার অতিথি। পুয়ের্টোরিকোতেই থাকি, কিন্তু কিংস্টনেও একটা বাড়ি রেখেছি–জানতে?'

'জানতাম তুমি কিংস্টনে থাকো,' বলল রানা। 'মিত্রার খবর কি?'

হঠাৎ বিষণ্নতার ছায়া পড়ল চিত্রার মুখে। দু'চোখে টলমল করছে উদ্বেগ। 'রানা, মিত্রাদির খবর পাব আশা করেই তোমাকে ডেকেছি আমি।'

'কেন, কি হয়েছে মিত্রার?'

'কেউ কোন খবর দিতে পারছে না ওর,' বলল চিত্রা। 'নানা রকম গুজব শুনছি। ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসও নাকি খুঁজছে ওকে। মিত্রাদির শেষ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ম্যাকাসারে, ওখান থেকেই নিখোঁজ। এসব প্রায় আট মাস আগের কথা। মাস তিন আগে আমি জাকার্তা হয়ে ম্যাকাসারে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে একটা ক্লু পাই। সেই ক্লু ধরে ফ্লোরেজ সী-র একটা দ্বীপ, কায়ূদানায় যাই। ব্রিটিশ চার্টে দ্বীপটাকে বলা হয়েছে আর্থকোয়েক আইল্যান্ড...!'

ভূমিকম্পের দ্বীপ। গেছে ওখানে রানা, কিন্তু চিত্রার তা জানার কথা নয়। ও বলে চলল, 'দুর্গম একটা জায়গাই বটে। দ্বীপটার দুই অংশের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা মাত্র একটাই, চার মাইল চওড়া লাভা ফীল্ডের ওপর দিয়ে চলে গেছে সেটা। এই চার মাইলের মধ্যে ছায়া বলতে কিছু নেই, শুধু এক জায়গায় চার-পাঁচটা পাম গাছ আর হাত পনেরো জায়গা জুড়ে চওড়া কাণ্ডওয়ালা কাঁটা গাছের ঝোপ। কেউ একজন একটা গাছের কাণ্ডে নিজের নাম লিখে রেখে এসেছিল, দেখাদেখি ট্যুরিস্টরা ওখানে গেলেই নিজেদের নাম লিখে রেখে আসে।' থেমে রানার চোখে চোখ রাখল চিত্রা, 'কিন্তু তুমি যদি যাও ওই কষ্টটা আর করতে হবে না তোমাকে। তোমার নাম লেখাই আছে ওখানে।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে যাচ্ছিল রানা। ভুরু কুঁচকে তাকাল চিত্রার

দিকে, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। 'মিত্রার হাতের লেখা, চিনতে পেরেছ?'
'হ্যাঁ। ওরই হাতের লেখা।'
অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। ভারত নাট্যমের বিখ্যাত নর্তকী মিত্রা সেন। মনে পড়ছে রাজশাহীর কথা, কোলকাতা-চিটাগাঙের কথা, নক্ষত্রখচিত কক্সবাজারের রাত্রির কথা, ক্যাসাব্লাঙ্কার ভিলা মোনালিসার কথা। ভিলা মোনালিসার সেই কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজছে: প্লীজ, রানা! তুমি আমাকে ভালবাসতে।...রানা, আমাকে বাঁচাতে পারবে না? প্লীজ, আমাকে বাঁচাও!

'তারপর?'

'দ্বীপের ওধারে যেতে পারিনি, ওখান থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসতে বাধ্য হই। রানা, আমার বিশ্বাস, মিত্রাদি ওখানে বন্দী হয়ে আছে–এবং তোমার সাহায্য চাইছে ও।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু চিত্রা অন্যদিকে তাকাতে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও দেখল দশাসই এক লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দেহটা প্রকাণ্ড কিন্তু ছেলেমানুষের মত সরল, অভিমান ভরা, ছোট একটা মুখ। চোখ দুটো ম্লান, যেন এইমাত্র কেঁদেকেটে এল মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে।

'রায়ানের বন্ধু, মি. রুবেন। স্ত্রী বিয়োগের ফলে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ইউরোপ থেকে এসেছেন এদিকে বেড়াতে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছেন না কোথাও।'

কাছে এসে দাঁড়াল রুবেন। পরিচয় করিয়ে দিল চিত্রা, 'ইনি মাসুদ রানা, একই পেশায় ছিলাম আমরা। আপনার কথা বলেছি ওকে।'

রানা বলল, 'বসুন, মি. রুবেন। কেমন লাগছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ?'

'ভালই। কাল ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে যেতে চাই, মিসেস রায়ানের কাছ থেকে তাই অনুমতি নিতে এলাম।' একটু বিরতি নিয়ে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'মিসেস রায়ান আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এখানে, ওর কথা ছাড়া এক পা নড়ি না। জুলিয়ার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা, ওকে দেখে জুলিয়ার কথা মনে পড়ে যায়, তাই ইউরোপ থেকে ছুটে এসেছি। জুলিয়ার কথা মিসেস রায়ান নিশ্চয়ই আপনাকে শুনিয়েছেন?'

আর কেউ স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা এভাবে প্রকাশ করলে বিরক্ত হত রানা, কিন্তু রুবেনের কথায় ও ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে সহানুভূতি অনুভব করল ও।

'ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে যেতে চান? তা বেশ তো, রানার সঙ্গেই বেড়িয়ে আসুন তাহলে। আগামীকাল তো যাচ্ছে ও।'

'খুব খুশি হব,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রানা। মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করা এক কথা, আর মূর্তিমান একটা শোককে সঙ্গ দেয়া আরেক কথা। 'তুমিও

চলো না, চিত্রা?'

'ইচ্ছা করছে,' চিত্রা বলল। 'কিন্তু রায়ান না ফিরলে যাই কিভাবে? তোমরা কালই যাও, পরশু না-হয় আমি যোগ দেব তোমাদের সঙ্গে।'

'রায়ানকেও নিয়ে যেয়ো।'

'কাজ-পাগলা মানুষ, সময় পাবে কিনা জানি না,' বলল চিত্রা। 'তবে চেষ্টা করব তো বটেই।'

রুবেন ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এই সময়। 'ফেরীর টিকেট তাহলে কিনে ফেলতে হয় এখনই, তা নাহলে কেবিন খালি পাওয়া যাবে না একটাও।'

একদল মার্কিন ন্যাভাল অফিসার ঢুকল রেস্তোরাঁয়। সঙ্গে সঙ্গে ক'টা মেয়ে। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় রুবেন মেয়েগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোধহয় জুলিয়ার সাথে সাদৃশ্য খুঁজছে। করুণা বোধ করল রানা।

'আমার প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দাওনি তুমি, রানা।' চিত্রার কথায় চোখ ফেরাল রানা। 'দ্বীপ কিনছ কেন? কিংস্টনেই বা কি করছ?'

'ওখানে খামার বাড়ি কিনেছি একটা।'

'তার মানে? ঘর-সংসার করতে যাচ্ছ নাকি? বিয়ে?'

হাসল রানা। 'অবাক হচ্ছ কেন? বিয়ের বয়স হয়নি নাকি?'

'সত্যি বিয়ে করতে যাচ্ছ? সত্যি?' চিত্রা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'মেয়েটা কে?'

'চিনবে না। নাম, রেবেকা। এখন সিঙ্গাপুরে আছে। পৈতৃক ব্যবসা গোটাতে গেছে ওখানে। ওরই হুকুম, দ্বীপ চাই।'

'খামার বাড়ি কিনেছ, বিয়ে করবে···কেন যেন খুব অবাক লাগছে, রানা!'

'শুধু কি খামার বাড়ি? চাষবাস, সেই সঙ্গে ডেয়ারী ফার্ম। ভক্তও পেয়েছি একটা। তার নাম রেখেছি রকি। কুকুরটা দু'চোখে দেখতে পারে না রেবেকাকে, ওকে নিয়ে গল্প করতে বসলেই ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে, হিংসুটের ধাড়ী।' চিত্রাকে হাসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, গলাটা ভিজিয়ে নিই আগে।'

বারের সুইংডোর খুলতেই ধাক্কা মারল কানে কথাবার্তার উচ্চকিত গুঞ্জনটা। ভিতরে পা রাখল রানা। জুক-বক্সের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে ঠোঁটে শিস। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। পাশে চিত্রা।

কাউন্টারে নিগ্রো বারম্যান। তার পেছনে ছয় ফুট লম্বা আয়না।

আয়নায় চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মাঝপথে কাটা পড়ল শিস। একটা ঝাঁকুনি, পরমুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল শরীরটা। দু'আঙুলের মাঝখান থেকে পড়ে গেছে চুরুটটা খেয়ালই নেই রানার। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। রক্তশূন্য প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো চকচক করছে নিয়নের আলোয়।

আয়নায় শুধু মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে লোকটার। কে ও?

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠছে রানা। কুঁচকে গেছে চোখ দুটো ওর। ভাল করে দেখে নিঃসন্দেহ হতে চাইছে এখন। কে ও? বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নিতে নিতে ভাবছে ও! দাতাকু? কিন্তু! ...দাতাকু? নাকি তার প্রেতাত্মা? দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো?

ধীরে ধীরে মুখ তুলল লোকটা। আয়নার ভিতর দিয়ে সোজা তাকাল রানার চোখে।

শিউরে উঠল রানা। দাতাকু!

কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে আছে সে। সামনে রাখা সোনালী হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। দুই হাতের দশটা আঙুল গ্লাসটাকে ধরে আছে আঁকড়ে। চকচকে পিতলের মত, ভুরুহীন মুখ। সাদা দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে আধহাত লম্বা কালো একটা টোব্যাকো পাইপ। একদিকের ঠোঁট ফাঁক হতে বেরিয়ে পড়ল আরও কয়েকটা দাঁত।

বাঁকা হাসছে সে। রানার চোখে চোখ।

মাত্র পাঁচ সেকেন্ড, তারপরই ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিল সে মুখটা।

বিহ্বল দেখাচ্ছে রানাকে। ভিজে গেছে মুখ, ঘামের কয়েকটা রেখা কপালের পাশ থেকে নিচে নামছে।

'রানা! কি হয়েছে তোমার, রানা?' চিত্রা অস্ফুটে জানতে চাইল। 'তুমি কি অসুস্থবোধ করছ?' রানার কোমর জড়াল চিত্রার একটা হাত। টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাতে চায় ও রানাকে।

চিত্রার একটা হাত জোরে চেপে ধরল রানা। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও। একরকম টেনেই চিত্রাকে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

ভয় পেয়েছে রানা। ভয় পেয়েছে থাইপুজম দাতাকু হাইয়াতকে দেখে।

পালাচ্ছে সে।

দুই

পাঁচতলায় চিত্রার স্যুইট। চিত্রার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রানা।

খুট করে শব্দ হলো একটা, আলো জেলে রানার সামনে এসে দাঁড়াল চিত্রা। চোখ মুখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি ওর। পুরোপুরি বদলে

গিয়েছিল রানা, বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ওর চোখ মুখ, দৃশ্যটা কখনও ভুলবে না চিত্রা।

'চিত্রা, আমি চলে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'যতক্ষণ আছি এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না তুমি।'

'কেন?'

'এক সেকেন্ডের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে...সে অনেক কথা, চিত্রা,' বলল রানা। 'সে-সব তোমার শুনে দরকার নেই।'

'কি এমন ঘটল যে তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারব না?' চিত্রার চোখেমুখে বিস্ময় ফিরে আসে, 'ব্যাপার কি, রানা?'

'আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলছি, চিত্রা।'

'কি বলছ তা তুমি নিজেই জানো না!' চিত্রার কণ্ঠে ক্ষুব্ধতা, 'আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছ? কি মনে করো তুমি আমাকে?'

'তর্ক কোরো না,' বলল রানা। 'তুমি জানো না লোকটা...'

রানার শার্টের কলার চেপে ধরল চিত্রা। 'ভুলে গেছ, কিছুদিন আগেও আমি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে ছিলাম? তুমি ভাবছ নিজেকে রক্ষা করার মত যোগ্যতা আমার নেই? বাজে কথা রাখো, এখন বলো কি হয়েছে?' ঈষৎ শ্লেষও যেন ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, 'তুমি! তুমি মাসুদ রানা কি এমন দেখলে যে এমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছ?'

জোর করে হাসল রানা। 'ভয় আমি নিজের জন্যে পাই না, চিত্রা।'

'আমার নিরাপত্তার কথা দয়া করে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল চিত্রা। 'তুমি জানো না, রায়ান পুয়ের্টোরিকোর অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ। নিজের স্বামী বলে গর্ব করছি না, কথাটা সত্যি বলেই বলছি, রায়ানের কথার ওপর কথা বলে এমন লোক এখানে খুব কম। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা অনেকেই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' রানার শার্টের কলার ছেড়ে ওর একটা হাত চেপে ধরল সে। 'এসো, গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও আগে। তারপর বলো, কি হয়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসল রানা। ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে হুইস্কি ভর্তি দুটো গ্লাস নিয়ে এল চিত্রা। রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা গ্লাস। তারপর বসল মুখোমুখি সোফাটায়।

প্রায় ভরা গ্লাসটা দু'তিন চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল রানা, মাথাটা নিচু, চেয়ে আছে কার্পেটের দিকে। ভাবছে।

'নাও, শুরু করো,' সব কিছু লক্ষ করে পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল চিত্রা, 'প্রতি একশোটা বাক্যের বিনিময়ে এক গ্লাস করে হুইস্কি পাবে।'

মুখ তুলে মৃদু হাসল রানা। কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান হয়ে গেল হাসিটা, 'কঠিন একটা ব্যাপার, চিত্রা। দাতাকু নামে একটা লোক, সিঙ্গাপুরিয়ান...'

'দেখেছি ওকে,' বলল চিত্রা। 'হ্যাঁ, দেখতে ভয়ঙ্কর লোকটা। মানে, ভুরু নেই, হাত দুটো পোড়া। আর পেটা লোহার মত শরীর।'

'দুটো হাতেরই চামড়া পুড়ে গেছে,' চিত্রার চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'চিত্রা, লোকটা কেন এসেছে এখানে আমি জানি। প্রতিশোধ নিতে চায় ও, খুন করতে চায়।'

চিত্রার চোখে মুখে স্পষ্ট বিস্ময়, রানার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে আছে সে। প্যাকেট থেকে চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রানা। গ্যাস লাইটার দিয়ে তাতে আগুন ধরাচ্ছে। চিত্রার নজর এড়াল না, হাত দুটো কাঁপছে রানার।

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাগুলো, বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'কিন্তু কোন ভুল নেই, প্রতিশোধ নিতেই এসেছে দাতাকু পুয়ের্টোরিকোয়।'

'রানা!'

সোফায় হেলান দিল রানা, হাতলে রাখল বাঁ হাতটা। চুরুটটা পুড়ছে, নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। 'পাঁচ বছর আগের ঘটনা, আমি তখন ছুটি নিয়ে ব্যাঙ্ককে, তবে মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে ছুটির, হপ্তাখানেকের মধ্যে ঢাকায় ফিরব, এমন সময় সাড়া জাগানো একটা ঘটনা ঘটল ওখানে। কোটিপতি ব্যবসায়ী রম্বক লানাথবকে কিডন্যাপ করা হলো। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ দাবি করল দশ লক্ষ ডলার।'

'মনে আছে ঘটনাটা। লানাথবকে খুন করা হয়। কিডন্যাপারদের একজন মাত্র ধরা পড়ে, সেই খুন করেছিল। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত যাবজ্জীবন হয় তার।'

'না, সে খুন করেনি,' বলল রানা। 'দোষটা আমার। আমিই ভুল করে…'

'প্রথম থেকেই বলো বরং, রানা।'

'থাইল্যান্ড সরকার ঘটনাটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেয়। গোটা ব্যাঙ্কক শহরটাকে অবরোধ করা হয় ঘটনা ঘটার তিন ঘণ্টার মধ্যে। পুলিস তো ছিলই, ঘরে ঘরে সেনাবাহিনীর লোকেরা ঢুকে তল্লাশী চালাতে শুরু করে কিডন্যাপাররা ব্যাঙ্কক ছেড়ে পালাতে পারেনি, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এই অনুমানটা ছিল ভুল। তাই কোন হদিসই করা গেল না তাদের। এসব খবর আমি কাগজে পড়ি।'

'তুমি তখন ব্যাঙ্ককেই?'

'না,' বলল রানা। 'ব্যাঙ্কক থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে, কুরজিতে হোটেলেই উঠতাম, কিন্তু বন্ধু ছাড়ল না। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে যাবে সে, বলল বাড়িটা তুমি ব্যবহার করো। তারপর হাসতে হাসতে বলল, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসেছ, হোটেলে কতরকম বিপদ ঘটতে পারে–তার দরকার কি! আমার বাড়িটা গোটা থাইল্যান্ডে সবচেয়ে নিরাপদ বাড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ কথার অর্থ? বন্ধু বলল, 'বাড়িটা থাইপুজম দাতাকু হাইয়াতের, আমি তার ভাড়াটে।'

ঘন ঘন টান দিল রানা চুরুটে। তারপর আবার বলল, 'বন্ধু কিন্তু ব্যাখ্যা করল না কথাটা, তার দরকারও ছিল না। থাইল্যান্ডের আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে যারাই এক-আধটু খবর রাখে, দাতাকুর নাম তাদের কাছে পরিচিত। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে ওর পার্থক্য হলো, যেকোন ঝুঁকি নিয়ে হাসতে হাসতে অপরাধ ঘটিয়ে বসতে পারে সে। রেপ, মার্ডার, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, কিডন্যাপ—সুযোগ পেলে কোনটাই বাদ দেয়ার লোক নয় দাতাকু। পুলিস সব জানত ওর সম্পর্কে, কিন্তু কোন কেসেই তাকে তারা ফাঁসাতে পারেনি। তার মানে, শুধু যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক সে তাই নয় মগজটাও দামী।'

'রম্বক লানাথবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?'

'বলছি,' বলল রানা। 'দাতাকু থাকত একই বাড়িতে, আমার বন্ধুর পাশের ফ্ল্যাটে। আমার সঙ্গে কোনদিন কথাবার্তা হয়নি। প্রায়ই দেখতাম অনূঢ়া বৈভবকে সাথে নিয়ে গল্প করছে।'

'অনূঢ়া বৈভব?'

'ওহো, ওর কথা বলিনি বুঝি?' টান দিতে গিয়ে দেখল রানা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সে চুরুটটা। 'অনূঢ়া বৈভব সতেরো আঠারো বছরের একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে, থাইল্যাণ্ডকে মাতিয়ে রেখেছে তখন সে তার নাচ দিয়ে। দাতাকু ছিল এই অনূঢ়ার প্রেমে পাগল।'

'ভয়ঙ্কর প্রকৃতির পুরুষকে এক ধরনের মেয়েরা ভালবাসে।'

চিত্রাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। রাতে একদিন বসে আছি ব্যালকনিতে, নদীর ওপারে নিয়ন বাতিতে ঝলমলে শহর দেখছি, এমন সময়ে দাতাকুর চড়া গলা কানে এল। ওদের সব কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু যতটুকু শুনলাম তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। অনূঢ়া বৈভব দাতাকুকে ভালবাসে না, ভয় করে। দাতাকুর বেডরুমে আসে সে প্রেমের টানে নয়, না এলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু করবে দাতাকু, তাই। দাতাকু দাবি করছিল, বিয়ে করতে হবে তাকে এবং বিয়ের তারিখও তাকে জানিয়ে দিতে হবে সেই মুহূর্তে। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার সাহস ছিল না অনূঢ়ার, নানান অসুবিধের কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল সে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনূঢ়া কথা দেয়, বিয়ে যদি সে করে কোনদিন, দাতাকুকেই করবে, কিন্তু বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর উত্তরে দাতাকু কি বলেছিল, আমি শুনতে পাইনি।'

পায়ের উপর পা তুলে দিল চিত্রা। বলল, 'তারপর?'

'ধনী লোকেরা বেপরোয়া কিছু লোককে পোষে, জানো তো?' বলল রানা। 'দাতাকু এইরকম কয়েকজন কোটিপতির সিকিউরিটি ইন-চার্জ ছিল। রম্বক লানাথব যখন কিডন্যাপড হয়, দাতাকু তখন তার সিকিউরিটি ইন-চার্জ।'

'বুঝেছি...'

'রম্বক লানাথব কিডন্যাপড হয় বাড়ি থেকে। পেছনের পাঁচিল টপকে কিডন্যাপাররা ভেতরে ঢোকে। দাতাকু তখন ছিল অনূঢ়া বৈভবের হোটেলে। ব্যাঙ্ককে তখন শো করছে অনূঢ়া। যাই হোক, পুলিস তাদের কাজে কোন খুঁত রাখতে চায়নি, তাই রম্বক লানাথব কিডন্যাপড হয়েছে এখবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দাতাকুকে খুঁজতে শুরু করে এবং একটা বার থেকে তাকে অ্যারেস্ট করে। কিন্তু পরদিন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কারণ অনূঢ়া বৈভব পুলিসকে জানায়, লানাথব যখন কিডন্যাপড হয়, দাতাকু তখন তার কাছেই ছিল।'

খালি গ্লাস নিয়ে আর একবার উঠল চিত্রা। ফিরে এসে বসতে আবার শুরু করল রানা, 'পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দাতাকু কুরজিতে, নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। তার ফিরে আসার পরদিন রাতের ঘটনা...'

'থামলে কেন? বলো!'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দ পায়ে শিকারী বিড়ালের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল ও। আচমকা নব ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো।

করিডরে উঁকি দিয়ে কাউকে দেখল না রানা।

'সে-রাতে ঘুম আসছিল না কেন জানি,' সোফায় ফিরে এসে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল ও। 'বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছিলাম। এমন সময় দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। দূর থেকে ভেসে এলেও বিকট একটা আর্তনাদের অস্পষ্ট শব্দ ছিল সেটা, এল পেছনের জঙ্গল থেকে।'

'রাত তখন ক'টা?'

'আড়াইটা,' বলল রানা। 'শব্দটা এমন নাড়া দিয়েছিল আমাকে, নিজের অজান্তেই ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম আমি। কি মনে করে তাড়াতাড়ি বেডরুম থেকে বেরিয়ে দাতাকুর ফ্ল্যাটের দিকে তাকাই। জানালা দিয়ে দেখি, হাতে একটা পিস্তল, দাতাকু তার বেডরুমের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা চিৎকার, তারপর পিস্তল হাতে দাতাকু বেরিয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম। রম্বক লানাথবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, কথাটা ভুলিনি আমি। হঠাৎ অনেকটা ঝোঁকের মাথাতেই ঠিক করলাম, দাতাকু কোথায় যাচ্ছে দেখতে হবে। একটু পরেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে রানার কথা শুনছে চিত্রা। ধরিয়েছে মাত্র, সিগারেটটায় দু'বারের বেশি টান দেয়নি সে। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ডান হাতটার কনুই রেখেছে উরুর ওপর, কব্জির কাছে হাতটা ভাঁজ করা, হাতের উল্টো পিঠে চিবুক রেখে চেয়ে আছে রানার দিকে।

'বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকলাম দাতাকুর পিছু পিছু। একটা মজা খালের পাড় ধরে খানিক দূর যেতেই চাঁদের আলোয় একটা প্যাগোডা দেখতে পেলাম। গজ পঁচিশেক সামনে ছিল দাতাকু। প্যাগোডার ভেতর দ্রুত ঢুকে

গেল সে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকাচ্ছি, দাতাকু ঢুকেছে ত্রিশ সেকেন্ড হয়নি তখনও, পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো। সেই সঙ্গে একটা আর্তচিৎকার। পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে ছুটলাম আমি। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেই মুখোমুখি হলাম প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তির। কেউ নেই ওখানে। পাশেই একটা দরজা। খোলা দেখে ছুটে গেলাম সেদিকে। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেই মশালের লালচে আলোয় দেখলাম দাতাকুর হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মেঝের ওপর পড়ে আছে লানাথব। কুল কুল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ফুটো থেকে। কামরায় আর কেউ ছিল না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাতাকু। পিস্তল ধরা হাতটা ঝুলছিল শরীরের পাশে। কিন্তু আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে হাতটা তুলতে গেল। পা তুলে মারলাম আমি, দাতাকুর পিস্তলধরা হাতে গিয়ে লাগল লাথিটা। পিস্তল হাত ছাড়া হয়ে গেছে দেখে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আমার ওপর। অসুরের গায়েও বুঝি ওর মত জোর নেই, চিত্রা। প্রায় কাবু করেই ফেলেছিল আমাকে। কিন্তু জুজুৎসুর এক প্যাঁচে বাঁ হাতটা যখন মুচড়ে পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আটকালাম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা তখন ওর। কিছুই জিজ্ঞেস করিনি আমি। কিন্তু পুলিসের হাতে তুলে দেব বুঝতে পেরে অনর্গল কথা বলে যেতে শুরু করল সে। ওর কথাগুলো এখনও পরিষ্কার কানে বাজে আমার। আমার পায়ে ধরতেই শুধু বাকি রেখেছিল ও। বলেছিল: 'সত্যি আমি যে ভাল লোক নই, বিদেশী হলেও তা হয়তো তুমি জানো। জীবনে অনেক অপরাধ করেছি আমি, কিন্তু বিশ্বাস করো, লানাথবকে আমি খুন করিনি। তুমি এখানে ঢোকার এক মুহূর্ত আগে বেরিয়ে গেছে খুনী। বিশ্বাস করো, লানাথবের কিডন্যাপারদের খুঁজে বের করার জন্যেই ব্যাঙ্কক থেকে এখানে এসেছি আমি। আমার আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে নিয়ে এসেছে ওরা লানাথবকে। ওদেরকে শায়েস্তা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু যা ঘটে গেল এই মুহূর্তে, সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবে পুলিস।'

'তুমি কি বললে?'

'দেখলাম,' বলল রানা। 'দাতাকু ঠক ঠক করে কাঁপছে। বলছিল: আমাকে ছেড়ে দাও, রানা! লানাথবের খুনীর বিচার হবে স্পেশাল ট্রাইবুনালে। খুনটা আমি করিনি, তবু মৃত্যুদণ্ড কেউ রোধ করতে পারবে না আমার। কেননা, খুনীর হাতেও ছিল এই একই পিস্তল। থারটি এইট ক্যালিবারের কোল্ট। লানাথব যে পিস্তলের গুলিতে মারা গেছেন তা আমার পিস্তল থেকে বেরোয়নি। কিন্তু পুলিস প্রমাণ করতে চাইবে এবং করবেও যে বুলেটটা আমার পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে। তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইছি আমি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, ভাল মানুষ হয়ে যাব। অনূঢ়া বৈভবকে আমি ভালবাসি, ওকে নিয়ে আমি চলে যাব দেশ ছেড়ে। ভদ্র জীবন যাপন করব, বুদ্ধের নামে শপথ

করছি!'

চুরুটে আগুন ধরাল রানা। বলল আবার, 'কিন্তু ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না, চিত্রা! ভেবে দেখলাম, দাতাকুর কথাগুলো সত্য হলেও হতে পারে, আবার সত্য তো নাও হতে পারে। এসব রহস্যের সমাধান বের করা পুলিসের কাজ, আমার নয়। ঠিক করলাম, দাতাকুর বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে আমি কোন অভিযোগ জানাব না, শুধু যা দেখেছি আর শুনেছি তাই ব্যাখ্যা করে একটা লিখিত জবানবন্দী দেব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রানা। চিত্রাও কোন প্রশ্ন করছে না। থার্ডফ্লোরের মিউজিক হল থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।

হঠাৎ আবার শুরু করল রানা। 'দ্বিতীয় বুলেটটা পাওয়া যায়নি কোথাও। যদিও দুটো ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় লানাথবের শরীরে। সরাসরি একটা হার্টে ঢুকে শোল্ডার ব্লেড ফুটো করে বেরিয়ে যায়। এই বুলেটটা পাওয়া যায়। থারটি এইট কোল্ট থেকে ছোঁড়া হয়েছে সেটা। দ্বিতীয় বুলেটটা লানাথবের একটা কনুইয়ের ওপরের মাংস ছেঁচে দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বুলেটটা পাওয়া যায়নি কোথাও। জানালাটা ছিল নিচু, সম্ভবত ওই পথে অথবা দ্বিতীয় দরজা পথে সেটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু দাতাকুর বক্তব্য ছিল অন্যরকম।'

চুরুটের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল রানার মুখ।

'লানাথবকে কিডন্যাপ করার সঙ্গে জড়িত নয় সে, দাবি করে দাতাকু। তবে, স্বীকার করে, একটা গোপন রাজনৈতিক দল কিডন্যাপের পরিকল্পনা করে, তা সে জানত। সেই দলের এক লোক নাকি তাকে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল, কিন্তু সে-প্রস্তাব সে গ্রহণ করেনি। কিডন্যাপাররা তার বাড়িটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতেও সে রাজি হয়নি। চিৎকারটা শুনে তার মনে সন্দেহ জাগে, তাই সে প্যাগোডায় গিয়েছিল। প্যাগোডায় ঢুকে সে লানাথবকে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে। কিডন্যাপারদের একজন মাত্র লোক ছিল তার সঙ্গে, সে লানাথবকে কিংযেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল। দাতাকুর ধারণা, লোকটা লানাথবকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে, মুক্তিপণের টাকাটা একা হজম করার লোভে। দাতাকু প্যাগোডায় ঢুকেই গুলি করে লোকটাকে। বুলেটটা লানাথবের হাতের চামড়ায় দাগ কেটে সোজা বেঁধে লোকটার বাহুতে। সে তখন পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। তার বুলেট ঢোকে গিয়ে লানাথবের বুকে। লানাথবের বুকে গুলি লেগেছে দেখে দাতাকু নার্ভাস হয়ে পড়ে, তাই সে লোকটাকে ধরার কোন চেষ্টাই করতে পারেনি, লাফ দিয়ে খুনী বেরিয়ে যায় দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাইরের জঙ্গলে। মুহূর্তে কামরার ভেতর আমি ঢুকি।'

পুলিস তার এসব কথায় নিশ্চয়ই কান দেয়নি?'

'না,' বলল রানা। 'কিডন্যাপার লোকটার পরিচয় দিতে পারেনি দাতাকু।

পুলিস তার বিরুদ্ধে কিডন্যাপ ও মার্ডারের অভিযোগ আনে। কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবার ব্যাপারে আপত্তি ছিল আমার, তাই স্রেফ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জবানবন্দী লিখে পাঠাই আমি। কিন্তু ওর সর্বনাশ ঘটায় আসলে অনূঢ়া বৈভব। সে তার প্রথম জবানবন্দী প্রত্যাহার করে। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে লানাথব যখন কিডন্যাপড হয় দাতাকু তখন তার সঙ্গে ছিল না। দাতাকুর ভয়ে পুলিসকে সে মিথ্যে কথা বলেছিল।'

'তারপর?'

রানা বলল, 'এরপর ঢাকায় ফিরে আসি আমি। খবরের কাগজে দেখি, যাবজ্জীবন হয়েছে দাতাকুর। মাস ছয়েক পর আবার যখন ব্যাঙ্ককে যাই আমি হোটেলে দু'জন নার্স দেখা করে আমার সঙ্গে। ওরা ব্যাঙ্কক সিটি জেলের হাসপাতালে চাকরি করত। তারা আমাকে একটা চিঠি দেয়, দাতাকুর লেখা। চিঠির লাইনগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার। দাতাকু লিখেছিল–'প্রিয় মাসুদ রানা, যে উপকার তুমি আমার করেছ তার জন্যে আমি ভয়ানক ভাবে তোমার কাছে ঋণী। এই জেলখানা থেকে যদি কোনদিন বেঁচে বেরুতে পারি, সে ঋণ আমি পরিশোধ করবই, এ ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ কোরো না। ইতি, তোমার পরম বন্ধু থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত।'

'নার্স দুজনকে ভুল বুঝিয়েছিল দাতাকু।'

'হ্যাঁ। তারা জানতই না চিঠিটার অন্তর্নিহিত অর্থ কি। সে যাক, এ ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি। সেবার ব্যাঙ্ককে ছিলাম হপ্তাদুয়েক, আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। কথায় কথায় সে আমাকে জানায় লানাথবের হত্যাকারী লোকটা গতকাল চোরা গুলি খেয়ে তার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, কিন্তু বাঁচবে না সে। ডাক্তারের কথা হেসে উড়িয়ে দিই আমি। বলি, লানাথবের খুনী যাবজ্জীবন খাটছে সিটি জেলে। আমার কথা শুনে ডাক্তার হাসে। বলে দাতাকুর কথা বলছেন? সে তো নিরপরাধ, থোয়ানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাকে।'

রানা থামতেই রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায় চিত্রা, 'তারপর?'

'ডাক্তার আমাকে থোয়ানের কাছে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফেরেনি তখনও তার। ডান বুকে চারটে বুলেট খেয়েছিল। নিজের কথা প্রমাণ করার জন্যে ডাক্তার পরপর কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিল তাকে। দশ মিনিট পর চোখ মেলল থোয়ান। চমকে উঠল আমাকে দেখে। ডাক্তার কোন কথাই বলেনি। প্রশ্ন যা করার আমিই করলাম। থোয়ান সব স্বীকার করল। বলল: 'আপনাকে আমি দেখেছিলাম পালাবার সময়।'

'স্বীকার করল সে-ই খুন করেছে লানাথবকে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা মৃদু কণ্ঠে। 'এরপর সোজা আমি ব্যাঙ্কক সিটির পুলিস-চীফের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাকে আমি বোঝাতে পারিনি ব্যাপারটা।

থোয়ান বেঁচে নেই, সুতরাং দাতাকুর বিচার দ্বিতীয়বার করা না করা সমান, এই ছিল তাঁর যুক্তি। তাছাড়া তাঁর ধারণা, দাতাকুর মত লোকের জেলের বাইরে থাকা উচিত নয়, নির্দিষ্ট একটা অপরাধ করে থাকুক বা না থাকুক। বিবেকের দংশনে ছটফট করতে থাকি আমি, সরকারী অফিসে পাগলের মত ছুটোছুটি করি বাকি ক'টা দিন। দাতাকু নিরপরাধ, জেল খাটছে সে আমার ভুলে, কোনমতে এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনেই নিতে হয় আমাকে ব্যাপারটা। নতুন করে, শুধু দাতাকুকে জেল থেকে বের করার জন্যে কেসটাকে জ্যান্ত করতে চাইল না কেউ। অগত্যা ভাঙা মন নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাই আমি।'

'জেল ভেঙে পালায় কবে জানতে না?'

'গত অক্টোবরে খবরটা বেরিয়েছিল পত্রিকায়। কয়েকজন প্রিজনার ব্যাঙ্কক সিটি জেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। গোটা একটা ব্লক ধ্বংস হয়ে যায়। একজন ওয়ার্ডার এবং একজন প্রিজনার পুড়ে মারা যায় সেই আগুনে। পালিয়ে যায় পাঁচজন। খবরটা পড়ে আমি আমার বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে ঘটনাটা চেক করতে অনুরোধ করি। তিনবার চেক করে সে ব্যাপারটা। ওভারশিওর হয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানায়, দাতাকু হাইয়াত পুড়ে মারা গেছে। জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও একটা বিবৃতি ছাপা হয় কাগজে, সেটাও আমার চোখে পড়ে। নিহতদের তালিকার শীর্ষে ছিল দাতাকুর নাম।'

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল রানা। খানিক পর বলল, 'খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। লোকটার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী, নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না, জানতাম। ও বেঁচে আছে দেখে আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু বুঝতেই পারছ খুশি হওয়ার কিছু নেই। দাতাকু সম্পর্কে যতটুকু জানি, ঋণ শোধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করবে সে কিন্তু আমি কি করব, চিত্রা? এই লোকটার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করা যায়?'

তিন

পালাচ্ছে রানা।

গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে বলল রুবেন, 'জোরে গাড়ি চালালে খুব রাগ করত জুলিয়া। ও যা পছন্দ করত না তা আমার করা উচিত নয়, কি বলেন, মি. রানা?'

রুবেনের সব কথার প্রথম এবং শেষ কথা জুলিয়া সান যোয়ান পোর্টে ঢুকছে গাড়ি। রুবেনের প্রতিটি কথার উত্তরে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে রানা, মাথায়

অন্য চিন্তা। থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত, থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত–গাড়ির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো যেন একই নাম আওড়াচ্ছে। ঠিক করেছে রানা, দাতাকুর কাছ থেকে সরে যাবে ও, দূরে থাকার চেষ্টা করবে। তাছাড়া করার আছেই বা কি? নিজেকে প্রশ্ন করেছে সে। দাতাকুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে? কি বোঝাপড়া আছে করার? তাতে লাভই বা কি? তাছাড়া, কে জানে এমনও তো হতে পারে যে দাতাকুর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়াটা একটা দৈব দুর্ঘটনা বৈ আর কিছু নয়। তাছাড়া জেল ভাঙা লঙটার্ম প্রিজনার, ধরা পড়ার ভয় নিশ্চয়ই আছে। ব্যাঙ্কক সিটি জেলে বাইশ জন লোক মারা গেছে। আগুন ধরাবার দোষটা তার ঘাড়েই চাপবে। এ কথা দাতাকু জানে। পিছু নিয়েছে, এমন নাও হতে পারে।

সকাল আটটায় হোটেল ম্যান্ডারিন ত্যাগ করেছে ওরা। চিত্রা সব রকম সাহায্য করেছে রানাকে। হোটেলের বিল মেটাবার দায়িত্বটা নিজেই নিয়েছে সে। এলিভেটর থেকে নেমে বাইরে এসে রানা রুবেনকে দেখেছে স্টার্ট দেয়া গাড়ির ড্রাইভিং সীটে ওর অপেক্ষায় বসে আছে। লাউঞ্জে ছিল না দাতাকু। হোটেলের বাইরেও তাকে দেখা যায়নি।

একা হলে কথা ছিল, ভাবছে রানা। কিন্তু রেবেকার সাথে জীবনটাকে এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছে ও, এখন আর কোন ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। দাতাকুর সঙ্গে যদি শত্রুতা থাকত, আলাদা কথা ছিল। এমন এক খুনী সে, যার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ও। তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?

ফেরীতে চড়েও বেচারা রুবেন নিজের স্ত্রীর কথা তুলে বকবক করেই চলেছে। বিরক্ত লাগছে, থামানো দরকার লোকটাকে। রানা প্রশ্ন করল, 'ক'দিন হলো উঠেছেন ম্যান্ডারিনে, মি. রুবেন?'

'সাতদিন।'

'দাতাকু নামে কোন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার? দিন তিনেক হলো সে-ও উঠেছে ম্যান্ডারিনে।'

'দাতাকু? না। এই প্রথম শুনলাম নামটা। জানেন জুলিয়ার এক কাজিনের নাম ছিল পোক–বিদঘুটে নাম, তাই না?'

'হ্যাঁ, যে লোকটার কথা বলছি, সে হয়তো অন্য নামে উঠেছে ম্যান্ডারিনে। লোকটা সিঙ্গাপুরিয়ান, থাইল্যান্ডেই বেশির ভাগ সময় থাকে।'

'ওহ্হো! আপনি ভুরুহীন, হাত পোড়া ঘোড়াটার কথা বলছেন? মি. রানা, আপনি শুনলে বিশ্বাসই করবেন না লোকটা কি খায়! রাম, আর তার সাথে ম্যারাজকিনো।'

'কথাবার্তা হয়েছে আপনার সঙ্গে ওর?'

'দু'একটা। কথা বলতে পারে এজন্যে বোধহয় ওর খুব দুঃখ। বোবা হয়ে

জন্মালে খুশি হত, কথা বলতে গিয়ে অন্তত তাই মনে হয়েছে আমার। একটা কথা পাঁচ সাতবার জিজ্ঞেস করলে একবার হুঁ করে।'

'পুয়ের্টোরিকোয় কেন এসেছে সে সম্পর্কে কিছু বলেছে নাকি?'

'শুধু এই প্রশ্নটারই উত্তর দিয়েছে সে ঠোঁট নেড়ে,' রুবেন বলল। 'পুরানো একটা ঋণ শোধ করতে এসেছে···হ্যাঁ, তাই তো বলল।'

ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে মুখ ওদের। বালুকাবেলার ওপর দু'জোড়া পায়ের দাগ রেখে ক্যারিবিয়ানের স্রোতের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে রানা ও রুবেন। দিগন্তরেখার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সূর্য, চোখ তুলে দেখতে পেল রানা। যতক্ষণ না ডুবল চোখ ফেরাতে পারল না ও।

সৈকত ছেড়ে ঘাসবনে ঢুকল ওরা। কাশবন আর নলখাগড়ার পাশ ঘেঁষে বালিয়াড়ি টপকে আরও ওপর দিকে উঠে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে দেখা হলো ছেলেমেয়ে দুটির। ষোলো বছরের কালো রাখাল ছেলে, সাথে তার পনেরো বছরের কিশোরী বোন। নাম সেগেল ও জুসি।

ক্যাডিজ আর রোটা, সাগরের দু'দিকে দুটো বাতিঘর, কিন্তু বালিয়াড়ির নিচে থেকে ওগুলোর আলো দেখার কোন উপায় নেই। পাহাড়ের ওপর চড়ল ওরা, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রাখাল বালক। দ্বীপটার নাম নীল নক্ষত্র, ব্লু স্টার। একটিমাত্র পরিবার বসবাস করে, নিলামে বিজয়ী মালিকপক্ষ চাইলে পরিবারটিকে স্থানান্তর করার সব দায়িত্ব নেবে মার্কিন সরকার। জুসি আর সেগেলের বাবা-মা হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছিল, ওদের দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। মিনিট পনেরো পর বিদায় চাইল রানা। বলল, যদি ও কিনতে পারে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না ওদের।

চারজনের পরিবারটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় দিল।

এঁকেবেঁকে নেমে গেছে ঢালু পথটা। ঘাসবনে ঢুকল ওরা। দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জুসির কচি গলার মিষ্টি গান ভেসে আসছে ওপর থেকে। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে শব্দটা।

রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে রুবেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চারদিকে মুগ্ধ চোখে দেখছে। চাঁদ ওঠেনি, কিন্তু বাতিঘরের আলোয় স্বপ্নের মত লাগছে পরিবেশটা। রুবেনের পাশে চলে এল রানা। 'জুলিয়ার কি যে ভাল লাগত এই দ্বীপ! জুলিয়া।'

এবং জুলিয়ার নাম মুখে নিয়েই ঢলে পড়ল রুবেন। গুলির আওয়াজটা কোন্‌দিক থেকে এল, টেরই পেল না রানা। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রুবেনের, কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

পরপর দু'বার জ্বলে উঠল ক্যাডিজ বাতিঘরের আলো। আলোকিত হয়ে উঠল

রানার মুখের বাঁ দিকটা। ঝপ্ করে বসে পড়ল ও ঘাসবনের ভিতর, সেই সঙ্গে ডান দিক থেকে জ্বলে উঠল একবার রোটা বাতিঘরের আলোটা। রুমাল দিয়ে রুবেনের মুখ থেকে বালি ঝাড়ল রানা। অভয় দিয়ে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে অতিকষ্টে দমন করল। মুহূর্তের জন্যে রুবেনের চোখ দুটো সজীব, বেপরোয়া হয়ে উঠল। কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে উঠছে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একবার, তারপর আরেকবার। মৃদু শব্দে বাতাস বেরিয়ে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। পরমুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা।

ঘাড় গুঁজে ঘাসবনের ভিতর বসে রইল্ রানা পাঁচ মিনিট। রুবেনের হাতঘড়ি টিক টিক টিক টিক করছে। রানার আঙুল বেয়ে হাতে, হাত থেকে কনুই পেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে কয়েকটা পিঁপড়ে। ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করছে সে।

জুসির গান এখন আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসে দুলছে ঘাসবন। কতটা দূরে রয়েছে দাতাকু, জানার কোন উপায় নেই। ঘাসবনের বাইরে থেকে গুলি করেছে বলে মনে হলো রানার। ঘাসবনে যদি এখন সে ঢুকেও থাকে, বোঝার কোন উপায় নেই। গুলি করেই কি সে ছুটে পালিয়েছে? নাকি জানে, ভুল লোককে খুন করেছে সে?

ওয়ালথারটা সঙ্গে নেই ভাবতেই শির শির করে উঠল গা। মাথা তুলল রানা একটু একটু করে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, ছুটে আসবে বুলেট। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় ব্যর্থ হয়েছে দাতাকু, দ্বিতীয়বার আরও কাছ থেকে গুলি করবে সে, আলোয় টার্গেট দেখে নিয়ে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে দাতাকু, রানা নিরস্ত্র।

নড়েচড়ে আরও একটু তুলল রানা মাথাটা। সাগরে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালছে আর নেভাচ্ছে বাতিঘর দুটো। সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। কিছুই ঘটল না।

এক পা পিছিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, রুবেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বিদায়!'

ঘাসবন থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে নিজের অজান্তেই একবার তাকাল রানা। সাদা হ্যাটটা শুধু দেখা গেল, তাও মুহূর্তের জন্যে। চোখের ভুল? বুকটা কেঁপে উঠল একবার। ঝাড়া তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ও। ঘাস দুলছে। আলোর বন্যায় চারিদিক উজ্জ্বল। সাদা হ্যাট পরা মাথাটা ঘাসের ওপর জাগল না আর। চোখের ভুল?

ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে সৈকতে ফিরে এল রানা। স্পীডবোটে চড়েও দ্বীপটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না ও। হ্যাটটা ভুল দেখেনি, না, ভুল হয়নি তার।

দ্বীপটা যখন অনেক দূরে হঠাৎ অপর দিক থেকে সাগরে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা বিন্দু। ব্যস্তভাবে ব্যাগ থেকে নাইট বিনকিউলারটা বের করল রানা।

ক্যাডিজের আলোয় আর কিছু চেনা গেল না, ছোট্ট স্পীডবোটটার ওপর সাদা হ্যাটটা ছাড়া।

সেন্ট জন দ্বীপে ফিরল রানা সাড়ে সাতটায়। খবর নিয়ে জানল, ফেরী নেই আজ রাতে। জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম করল ও। চিত্রাকে জানাল, নিলামে অংশ গ্রহণ করবে না সে। আগামীকাল সকালেই ফিরছে।

ট্যুরিস্টদের অসম্ভব ভিড় সেন্ট জনে। হোটেল গুডউডের লাউঞ্জে সাদাকালো চামড়ার মেলা বসেছে যেন। এলিভেটর থেকে নেমে সোজা নিজের স্যুইটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ইন্টারকমের সুইচ অন করে রুম সার্ভিসকে জানিয়ে দিল, সাড়ে ন'টার সময় যেন ডিনার পৌঁছে দিয়ে যায়। সঙ্গে দু'বোতল রাম, ত্রিনিদাদ স্পেশাল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, জুতো না খুলেই।

গুলির শব্দটা কানে বাজছে আবার। শব্দটা হওয়ার পরও দু'সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিল ও, ইচ্ছা করলেই দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারত দাতাকু। করেনি। সে রুবেনকে ভুল করেছে রানা বলে? না, তা সম্ভব নয়। রুবেন মেদবহুল, রানার দ্বিগুণ চওড়া, ভুল হতে পারে না। তাহলে?

অপ্রীতিকর চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ। ভুলটা দাতাকু ইচ্ছা করেই করেনি তো?

চুরুট ধরাল রানা। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। যতই চিন্তা করছে, ততই যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দাতাকুর উদ্দেশ্য: ভুল করেনি সে। রুবেনকেই গুলি করেছিল, রুবেনকেই খুন করতে চেয়েছিল, তাই-ই করেছে। না, ভুল হয়নি তার।

কিন্তু কেন?

রুবেনের সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা? মাত্র মৌখিক পরিচয় ছিল, শত্রুতার প্রশ্ন ওঠে না না, শত্রুতা নয়। তাহলে?

দাতাকু পিস্তল তাক করেছিল রুবেনের দিকে, কিন্তু অ্যাকশনটা রানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। রুবেনকে খুন করে রানাকে জানিয়ে দেয়া, কত সহজে তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে পারি আমি, দেখো। সেই সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের সূচনা। সমস্যা আর বিপদে ফেলে দিয়ে মজা পেতে চায় দাতাকু। ইচ্ছাটা তার পুরোমাত্রায় সফল হতে যাচ্ছে। রুবেন খুন হওয়ায় রানা এখন ফেরারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। লাশটা পাওয়া গেলেই ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের পুলিস ফোর্স খুঁজতে শুরু করবে রানাকে।

নিজেই পুলিস স্টেশনে গিয়ে সব কথা বলবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। সত্য কথাটা বিশ্বাস করানো ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াবে, তাকে হয়তো সেলে আটকে রাখবে রহস্যটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত। অথবা,

শেষ পর্যন্ত ওকেই অভিযুক্ত করে কেস্ দাঁড় করাবে পুলিস। দাতাকুকে পাওয়া না গেলে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে ওর।

রাত যখন দুটো, পায়চারি করছে চিন্তামগ্ন রানা। ছত্রিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, সামনে ছিল মধুর ভবিষ্যৎ, রেবেকাকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন। তাসের ঘরের মত ধসে পড়ছে সেই ভবিষ্যৎ, সেই সুখস্বপ্ন। এখন তা যেন এক চোরাবালি, সামনের দিকে তাকিয়ে সে ধু ধু শূন্যতাই দেখতে পাচ্ছে রানা।

চার

পরদিন সকাল।

বেড-টি এর কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা। দুটো বালিশের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে ও। পরনে কিছু নেই, শুধু সাদা একটা চাদর পা থেকে নাভি পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল ও।

বেলা দুটোর আগে কোন ফেরী নেই। মনটা একটু দমে গেল রানার। রিস্টওয়াচ দেখল, মাত্র আটটা বাজে। তার মানে আরও ছয় ঘণ্টা থাকতে হবে ওকে সেন্ট জনে।

ছয় ঘণ্টা! ছয় ঘণ্টায় অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

আধ ঘণ্টা পর শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। কোমরে বাটারফ্লাই ছাপা তোয়ালে। ওয়ারড্রোব থেকে বের করল স্যুটটা। তার পর স্যুটের সাথে রঙ মিলিয়ে র‍্যাক থেকে তুলে নিল খয়েরী রঙের হ্যাট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় বাঁধল লাল টাই।

ট্রাউজার্সের পকেটে ঢোকাবার আগে ওয়ালথারটা একবার চেক করে নিল রানা। ব্রেকফাস্ট নিচের রেস্তোরাঁতেই করার ইচ্ছা। দাতাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এরকম একটা বিশ্বাসই এখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে নিচে।

রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। ঢুকেই রানার মনে হলো তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখের দৃষ্টি ওকে বিদ্ধ করছে। চোখ বুলিয়ে দ্রুত একবার দেখে নিল চারদিকটা। কোথাও নেই দাতাকু। অন্তত তাকে দেখতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু অস্বস্তিটা তাতে দূর হলো না।

ওয়েটার এক কোণে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করল ওর জন্যে।

আধঘণ্টা পর ফাঁকা হয়ে গেল রেস্তোরাঁ। বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানাও। রাস্তায় বেরুনো দরকার, ভাবছে ও। দেখা যাক, কিছু ঘটে কিনা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল রানা। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের হাঁকডাক অগ্রাহ্য করে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। সুপার মার্কেটটা মাইল খানেক দূরে।

গেটের কাছে কয়েকটা দোকান। একটা টোব্যাকো শপে ঢুকে চুরুটের ক'টা বাক্স কিনল। চোখের দৃষ্টি দোকানের আয়নায়, রাস্তাটা দেখে নিচ্ছে রানা।

সুপার মার্কেটে ঢুকে আরও কিছু কেনাকাটা করল। বেশির ভাগই অ্যান্টিকস, রেবেকার জন্যে।

কড়া রোদে হেঁটে ফিরে এল হোটেলে। বুঝতে পারল বোকামি হয়ে যাচ্ছে, তবু দাতাকুকে অনুসরণ করতে না দেখে একরকম স্বস্তিই অনুভব করল।

আজ দেড়টায় চলে যাবে, রিসেপশনিস্টকে জানাল ও। বিল মিটিয়ে দিয়ে এলিভেটরে চড়ল। চারতলায় পৌঁছে দেখল করিডর ফাঁকা। দরজার সামনে দাঁড়াল। চাবি বের করল পকেট থেকে। আনমনে শিস দিতে শুরু করল। ঠিক করে ফেলেছে, আজই কিংস্টনের উদ্দেশে জাহাজ ধরবে সে পুয়ের্টোরিকো থেকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ক্ষীণ একটা নীলচে ধোঁয়ার রেখা সিলিঙের দিকে উঠে যাচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। লেদার দিয়ে মোড়া প্রকাণ্ড চেয়ারটার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেছে দাতাকুর শরীরটা। বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে, স্থির। চেয়ারের হাতলের ওপর বাঁ হাতটা পড়ে আছে। পোড়ার শুকনো দাগে ভর্তি হাতটা, তারই মধ্যেই অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে মুক্তো বসানো একটা আঙটি।

রানার পায়ের শব্দে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল দাতাকু। রানাকে দেখে মাথাটা একটু নাড়ল। ভুরুহীন হলুদ একটা মুখ, দাঁত দিয়ে কামড়ে আছে টোব্যাকো পাইপটা। একদিকের ঠোঁট বিস্তার করে একটু হাসল সে। 'গুড মর্নিং, মাইফ্রেন্ড! দাঁড়িয়ে আছ কেন, এগিয়ে এসে বসো!'

দু'সেকেন্ড নড়ল না রানা। তারপর দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ও। তালায় চাবি ঢোকাল। চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করল তালাটা। পকেটে চাবিটা ভরে ঘুরে দাঁড়াল আবার। দাতাকুর দিকে তাকাল না। দৃঢ় পায়ে তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল ও। দাঁড়াল ওয়াল ক্যাবিনেটের সামনে।

নির্ভেজাল হুইস্কি ভর্তি একটা গ্লাস হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে এসে বসল দাতাকুর সামনের সোফাটায়। কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'ইউ বাস্টার্ড, কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার! কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে!' পাইপটা মুখ থেকে নামাল দাতাকু। হেসে উঠতে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'আমি কি চাই তা তুমি জানো। আসলে, রানা, তুমি কি চাও সেটাই আমি জানতে এসেছি।'

'আমি কি চাই?'

'হ্যাঁ,' বলল দাতাকু। 'তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য, রানা। তুমি জানো, তোমার ঋণ শোধ করতে এসেছি আমি।' ক্রূর হাসি ফটল

দাতাকুর ঠোঁটে, 'ঋণটা কিভাবে শোধ করব তা জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছ তুমি, তাই না? তাহলে শোনো, তোমাকে আমি খোঁচাতে চাই, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে চাই!'

রানা চুমুক দিল গ্লাসে।

'তবে সেসব অনেক পরের কথা,' দাতাকু বলল, 'তাড়াতাড়ি মরেও শান্তি পেতে দেব না আমি তোমাকে, রানা। খোঁচা দেব জায়গা মত, যেখানে তোমার লাগবে।'

'কি ভেবেছ তুমি আমাকে, কাপুরুষ?' মৃদু হাসির সঙ্গে বলল রানা। 'জানো, এখনই মেরে তোমার হাড়গোড় সব গুঁড়ো করে দিতে পারি?' হাসিটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল রানার মুখ থেকে, বদলে গেল কণ্ঠস্বর। শান্তভাবে বলল ও, 'দাতাকু, একটা ভুল আমি করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলের জন্যে আমি অনুতাপে মরে যাচ্ছি, বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি, তা যদি ভেবে থাকো, মারাত্মক ভুল করবে তুমি। ভুলটা হয়ে গিয়েছিল, জেনেশুনে আমি করিনি। সেই পরিস্থিতিতে তোমাকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না। তুমি হয়তো জানো না, ভুলটা যখন ধরা পড়ে তখন তা শোধরাবার কোন চেষ্টাই আমি বাদ রাখিনি।'

'তাই নাকি?' দাতাকু বলল।

'কিন্তু চেষ্টা করলে হবে কি, তোমার সম্পর্কে পুলিসের ধারণা এতই খারাপ যে তারা তোমার প্রতি সুবিচার করার কথা ভাবতে পর্যন্ত রাজি হয়নি। আমি চাইলেও তোমাকে তাই জেল থেকে বের করতে পারিনি।'

'কিন্তু এসব কথা শুনে আমার লাভ?'

'ভুল হয়েছিল, সেজন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারি,' বলল রানা, 'তার বেশি কিছু নয়। তুমি যদি ভেবে থাকো আমাকে বিরক্ত করলে আমি চুপচাপ সহ্য করব, আর ভয়ে কুঁকড়ে থাকব, তাহলে খুবই ভুল করবে।' একটু থেমে কঠিন গলায় বলল ও, 'রুবেনকে খুন করার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে, দাতাকু।'

'রুবেনকে খুন আমি করিনি, রানা,' হাসতে হাসতে বলল দাতাকু, 'তুমি ওকে সঙ্গে নিয়েছ, দেখেই বুদ্ধিটা আসে মাথায়। বুঝতেই পারছ তুমি ওকে সঙ্গে না নিলে ও খুন হত না। এর জন্যে তুমি ছাড়া কে দায়ী, বলো?'

গম্ভীর শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'আমার যা বলার তা আমি বলেছি তোমাকে, দাতাকু। এবার তুমি যেতে পারো।'

ডান পা'টা বাড়িয়ে পকেটে হাত ভরল দাতাকু। রানার চোখে চোখ। পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার বের করল। নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। লাইটারটা জ্বলছে।

দাতাকুর চোখে চোখ রেখে চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সামনে ঝুঁকল

রানা। আগুন ধরাল চুরুটে।

লাইটার বন্ধ করে হাতটা ফিরিয়ে নিল দাতাকু।

'পুয়ের্টোরিকো হয়ে কিংস্টনে ফিরছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ঘর-সংসার পাতবে?'

উত্তর না দিয়ে পাশের নিচু তেপয় থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিল রানা।

'কি জানো, আমার প্রেম ভালবাসা সব ব্যর্থ করে দিয়েছ তুমি। অনূঢ়া হয়তো আমাকে ভালবাসত না কিন্তু ওকে আমি ভালবাসতাম। কি রকম ভালবাসতাম, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বিয়ে হলে নিশ্চয়ই ও আমার সেই ভালবাসা বুঝতে পারত। আমরা সুখী হতাম, রানা। কিন্তু সেই সুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে আমার জীবনটাকেই তুমি বরবাদ করে দিয়েছ! অনূঢ়ার ভালবাসা না পেলে আমার এ জীবনের কানাকড়িও দাম নেই, রানা। এ সবকিছুর জন্যে তুমি, একমাত্র তুমিই দায়ী। তোমাকে সুখী হতে দেয়ার কথা আমি তাই ভাবতেও পারি না।'

চেয়ে রইল রানা। 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'আছে,' বলল দাতাকু, 'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

মৃদু টান দিল রানা চুরুটে। ভাবলেশহীন মুখ। কিছুই বলার নেই যেন ওর।

'কি জানো, একা বেঁচে থাকা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়,' বলল দাতাকু, 'স্ত্রী অথবা বাপ-মা, অথবা ছেলে মেয়ে, অথবা বন্ধুবান্ধব–কিছু একটা অবলম্বন দরকার। এমন কি জেলখানাতেও তার একজন থাকা দরকার, যাকে সে হয় ভালবাসবে নয়, ঘৃণা করবে। সেই রকম একজন তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার। মা আমার বেঁচে নেই এবং কে আমার বাবা তা আমি জানি না। বন্ধু? তেমন বন্ধু কোনকালেই জোটাতে পারিনি। জেলে থাকতে অনূঢ়াকে ভালবাসার খুব চেষ্টা করেছি, রানা। কিন্তু নিরর্থক কাউকে তো ভালবাসা যায় না, তাই না? তোমার দোষে যাবজ্জীবন হয় আমার। জেল খাটা শেষ করে বেরোতে বুড়ো হয়ে যাবার কথা। তা জানার পর কেউ কি তার প্রেমিকাকে ভালবাসতে পারে? কি লাভ! রানা, সেলের ভেতর বসে পাঁচটা বছর ধরে কিছুই করার ছিল না আমার, শুধু তোমাকে ঘৃণা করা ছাড়া।'

'কিংস্টনে কোনদিন যাইনি,' রানার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার বলল দাতাকু, 'যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, সেই মেয়েটিকেও দেখার শখ রয়েছে আমার। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরবে কবে?'

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা।

'চলে যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল দাতাকুও। এক পা এগিয়ে রানার মুখোমুখি হলো সে। 'রানা, তোমার জায়গায় আমি হলে কি করতাম জানো?'

কথা বলল না রানা।

'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতাম,' বলল দাতাকু।

নড়ল না রানা। নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল ওর।

'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতাম,' চোখের ওপরের রোমহীন মাংস নেড়ে একই কথা দুবার বলল দাতাকু। 'বুঝতে পারছ অর্থটা? নিজের হাতেই শেষ করতাম কাজটা। আরও পরিষ্কার করে বলব? তোমার জায়গায় আমি হলে, আত্মহত্যা করতাম।'

প্রচণ্ড ঘুসিটা মুখের দিকে ছুটে আসছে দেখেও করার কিছুই ছিল না দাতাকুর। মাথাটা সরিয়ে নেয়ার মত সময়ও পেল না সে, শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শুধু। ঘুসিটা খেয়ে কেঁপে গেল লম্বা দেহটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। লাল ভাঁটার মত চোখ দুটো খোলা রইল, এক সেকেন্ড পর গল গল করে রক্তের দুটো স্রোত নেমে এল নাকের গর্ত দুটোর ভিতর থেকে।

আঙুলের গাঁটগুলো ব্যথা করছে রানার। রিস্টওয়াচ দেখে শ্রাগ করল ও, দেড়টা বাজতে এখনও অনেক বাকি। ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে সুটকেসটা তুলে নিল ও, দাতাকুর দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজা খুলে করিডরে।

পোর্টে পৌঁছে একটা রেস্তোরাঁয় বসল রানা। ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিয়ে ফোন বুদে গিয়ে ঢুকল। ডায়াল করল থানা হেডকোয়ার্টারে। একজন কেরানী জানতে চাইল, কে ফোন করছেন? রানা একজন অফিসারকে ডেকে দিতে বলল। মিনিট দেড়েক পর একজন ইন্সপেক্টর এল অপর প্রান্তে। দাতাকুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে রানা বলল, 'লোকটাকে গুডউড হোটেলের চারতলায়, ছাব্বিশ নম্বর রুমে পাবেন। এখুনি লোক পাঠালে...

'আপনি কে বলছেন, মিস্টার?'

'আমার পরিচয়টা আমি গোপন রাখতে চাই...'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিহ্বল হয়ে পড়ল রুবেনের মৃত্যু সংবাদে।

রায়ান অত্যন্ত বাস্তববাদী ও বুদ্ধিমান, রানার সমস্যাটা দ্রুত অনুধাবন করে নিল সে। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনেই কিভাবে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা যায় ভেবে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যখন সে জানল যে দাতাকুকে পুলিসের হাতে রুবেনের খুনী হিসেবে তুলে দিতে চেষ্টা করলে রানা নিজেই বিপদে জড়িয়ে পড়বে, রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে তখন উদ্বেগ প্রকাশ করল সে।

চিত্রার পরামর্শ একটাই: পথ থেকে সরাও দাতাকুকে। কোন সন্দেহ নেই, তোমার জীবনে ও একটা অভিশাপ। তুমি যদি বাঁচতে চাও, রানা, সমাধান ওই একটাই...

কিংস্টনে দিন পনেরোর মধ্যে যাবে ওরা, নিজেদের বাড়িতে জানিয়ে রাখল

অগ্রিম আমন্ত্রণ। হোটেল প্রিমিয়ারে ডিনারের লোভও দেখাল চিত্রা।

বিদায় নেয়ার সময় রানা শুধু বলল, 'দাতাকুর ওপর হাত তুলতে বাধছে, চিত্রা। অস্বীকার করে লাভ নেই, ওর জীবনটা সম্ভবত আমার জন্যেই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সমাধান কি তাহলে?'

সমাধান কি?

গত পনেরো দিন এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে রানা। চিত্রার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি ও। খামার বাড়িতে পনেরো দিন কাটিয়ে আজ আবার কিংস্টনে যাচ্ছে, চিত্রাদের বাড়িতে। মনে পড়ে গেলেই প্রশ্নটা উঁকিঝুঁকি মারছে মনে, সমাধান কি? দাতাকুকে বুঝিয়ে ফল হবে না, ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না...

চিত্রা ও রায়ান জানিয়েছে, কয়েক হাজার মাইল দূরের ব্যাঙ্কক সিটি জেলখানায় কবে কি ঘটেছে না ঘটেছে তা নিয়ে স্থানীয় পুলিস মাথা ঘামাবে বলে তারা মনে করে না।

সেন্ট জনের পুলিস ইন্সপেক্টর দাতাকুকে গ্রেফতার করার জন্যে পুলিস পাঠিয়েছিল কিনা, পাঠিয়ে থাকলেও তারা দাতাকুকে গ্রেফতার করতে পেরেছে কিনা জানার সুযোগ হয়নি রানার। সম্ভবত পালিয়েছে দাতাকু। গ্রেফতার হলে পুয়ের্টোরিকোয় খবর পৌঁছুত। খবর পাওয়া মাত্র ফোন করার কথা ছিল চিত্রার। করেনি।

বাড়িটা ছোট্ট। চারদিকে ফুলের বাগান। চিত্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সব।

সন্ধ্যার পর বেরুল ওরা।

হোটেল প্রিমিয়ারের সামনে থামল গাড়ি। নামছে তখন চিত্রা, একটা হাত ধরাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

মুচকি হাসল চিত্রা। কৌতুক ঝিলিক মারছে দু'চোখে। বলল, 'হোটেলে তোমার জন্যে একটা চমক আছে। জানতে চেয়ো না, নিজেই দেখতে পাবে।'

'নারী রহস্যময়ী!' মন্তব্যটা রায়ানের।

স্টেজটা রেস্তোরাঁরই এক প্রান্তে। রিজার্ভ করা টেবিলে বসে চিত্রা নিজের জন্যে শ্যাম্পেন, রানা আর রায়ানের জন্যে দিল হুইস্কির অর্ডার।

বোঝা গেল, প্রিমিয়ারে প্রায়ই ডিনার খায় ওরা। অন্যান্য টেবিলের প্রায় সবাইকে চেনে।

পেছনের টেবিলে প্রাক্তন ভারতীয় মহারাজা, আর পাশের মেয়েটি তার ছোট বউ। মেয়েটি আইরিশ। বড় বউটি জাপানী, মাসের শেষের দিকে তাকে নিয়ে আসে সাথে করে। বাঁ দিকে যে মেয়েটি, প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা, আর মাঝে মধ্যে হেসে উঠছে জোরে, হলিউডের একজন উঠতি অভিনেত্রী সে। তার পাশের টেবিলে ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই পেইন্টার, নৃত্য উপভোগ

করতে এসেছে। ডান দিকের টেবিল তিনটে যথাক্রমে ফ্রেঞ্চ, ক্যানাডিয়ান আর ইটালিয়ান অ্যামব্যাসীর লোকদের দখলে। আর ওই প্রান্তে, খানিক আগে যে লোকটা টেবিলের ওপর পড়ে গিয়ে প্লেট ভাঙল, ও হলো সাউথ আমেরিকার এক মিলিওনিয়ার, ওর সঙ্গের মেয়েটি গত বছর কিংস্টনের টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

ডিনার সার্ভ করে গেল ওয়েটার। ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় লাউড স্পীকার গমগম করে উঠল: এখন থেকে একঘণ্টা পর আমাদের আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। আজকের শিল্পী প্রাচ্যের প্রখ্যাত নর্তকী অনূঢ়া বৈভব!

তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল হলঘর।

অনূঢ়া বৈভব! চিত্রার দিকে তাকাল রানা।

'কি, খুব চমকে গেছ, না?'

চমকটা আনন্দের নয়, চিত্রা। মনে মনে বলল রানা। অনূঢ়া বৈভবের প্রেমে অন্ধ ছিল দাতাকু। দাতাকুকে ও পুলিসের হাতে তুলে না দিলে দাতাকুরই জীবন-সঙ্গিনী হত সে। কুক্ষণই বলতে হবে, নইলে ঠিক এই সময় এখানে কেন অনূঢ়া!

গোটা পরিবেশটা পাল্টে গেছে এক মুহূর্তে। কিছু একটা ঘটবে অনুমান করে সচেতন হয়ে উঠল রানা। হলরুমের চারদিকটা দেখে নিল একবার ও। আছে, এখানেই কোথাও আছে দাতাকু। দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু অনুভব করছে স্পষ্ট।

'কি হলো তোমার, রানা? কিছুই যে খাচ্ছ না?'

খাবারে মন দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। খানিকপর বলল, 'খিদে নেই।'

'বাড়ি ফিরতে চাও?'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'অনূঢ়ার নাচ না দেখে ফিরছি না।' ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে চুরুট ধরাল ও। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে দেখে নিল আশপাশটা ভাল করে। কোথায় দাতাকু?

কাটতেই চায় না ঘণ্টাটা। কিছু করার নেই, তাই রামের বোতলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল ও সারাক্ষণ।

তারপর দপ্ দপ্ করে নিভে গেল হলঘরের প্রায় সব ক'টা আলো। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শুধু স্টেজটা। নেপথ্যে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল যন্ত্রসঙ্গীত। সেই সঙ্গে আবার করতালি। কালো পোশাক পরা একজন সঙ্গীকে নিয়ে স্টেজে প্রবেশ করছে অনূঢ়া।

আরও সুন্দরী হয়েছে অনূঢ়া বৈভব। যৌবন তার পরিণত হয়েছে এই ক'বছরে।

লাল সিল্কের ওপর সোনালী ফুল তোলা সারং পরেছে অনূঢ়া, গায়ে গাঢ়

হলুদ ব্লাউজ।

অর্কেস্ট্রা থেকে পশ্চিমা সঙ্গীতের উদ্দাম ঝড় উঠছে। অনূঢ়ার সঙ্গীটি কৃষ্ণ, অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছে সে পেছন ফিরে। আর রাধার ভূমিকায় অনূঢ়া, মান ভাঙাবার জন্যে কৃষ্ণকে ঘিরে নাচছে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়। কৃষ্ণের মন টলল। শুরু হলো রাধা-কৃষ্ণের লীলা নৃত্য—সে এক বন্য লীলা!

সঙ্গীত উদ্দাম হয়ে উঠছে আরও। একে একে দেহের আবরণ সব খুলে ফেলছে অনূঢ়া। হাত দুটো আড়মোড়া ভাঙার অলস ভঙ্গিতে পেছন দিকে নিয়ে গেল সে। হুক খুলছে বক্ষবাসের।

অনূঢ়ার পরনে এখন শুধু স্বচ্ছ নাইলনের জাল। সঙ্গীতের দ্রুত তালের সাথে তাল রেখে বুক কাঁপাচ্ছে সে, আলোড়ন তুলছে নিতম্বে। কৃষ্ণ তাকে ধরতে চায়; আর থর থর করে যৌবন কাঁপতে থাকে অনূঢ়ার।

পরমুহূর্তে কৃষ্ণের লোলুপতার শিকার হয়ে পড়ে রাধা। অনূঢ়ার স্বচ্ছ গাত্রাবাস খুলে আসে কৃষ্ণরূপী সহশিল্পীর হাতের মুঠোয়।

ঊর্ধ্বাঙ্গে এখন আর কিছু নেই অনূঢ়ার। কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে স্টেজ ছেড়ে নেমে পড়ে সে, লুকোচুরি খেলছে সে এখন কৃষ্ণের সাথে। দর্শকদের ভিতর লুকোবার জায়গা খুঁজছে।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে অনূঢ়া চিত্রাদের টেবিলের দিকে। স্টেজে আলো নেই, একটা উজ্জ্বল স্পট লাইট শুধু অনুসরণ করছে নৃত্যপরা নগ্নিকার গতিকে।

রুদ্ধশ্বাসে নাচ দেখছে সবাই, কোন দিকে খেয়াল নেই কারও, কিন্তু একটা দরজা খোলার শব্দ ঢুকল রানার কানে। অস্পষ্ট আলোয় ও দেখল একজন ওয়েটার এগিয়ে যাচ্ছে অনূঢ়ার দিকে, তার হাতে ফুলের একটা প্রকাণ্ড স্তবক। ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। প্রেজেন্টেশন? বাইরে থেকে?

অনূঢ়া তখন ওদের টেবিলের কাছে চলে এসেছে। ওয়েটারকে সামনে দেখে সহাস্যে থামল সে। ফুলের স্তবকটা দু'হাত দিয়ে ধরতে যাবে, হঠাৎ কি দেখে থমকে গেল, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা কার্ড। ছোট্ট, ভিজিটিং কার্ডের মত দেখতে, সেটা পড়তে শুরু করল অনূঢ়া। রানা লক্ষ করছে মুখটা।

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখাল অনূঢ়াকে, যেন কার্ডের লেখাটার অর্থ বোধগম্য হয়নি তার। আবার পড়তে শুরু করল, অর্থটা বুঝতে পেরেছে এবার। এক পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখের হাসি। চোখের পাতা নড়ে উঠল ঘনঘন। ডান হাতটা ঝুলে পড়ল শরীরের পাশে, মুষ্টিবদ্ধ। আচমকা থরথর করে একবার কেঁপে উঠল শরীরটা, পরমুহূর্তে সবেগে ঘুরে দাঁড়াল অনূঢ়া। দ্রুত এগোল ক'পা, দাঁড়াল, মাথায় হাত তুলে চুলের ওপর হাত বুলাল একবার। টলমল করছে শরীরটা, যেন মাথা ঘুরছে। আবার পা বাড়াল অনূঢ়া।

প্রায় ছুটে উঠে পড়ল সে স্টেজে। স্পটলাইট তাকে আর অনুসরণ করছে না। হঠাৎ জ্বলে উঠল সব আলো। অনূঢ়াকে তখন দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'ভুল করে কেউ অবাঞ্ছিত প্রস্তাব পাঠিয়েছে সম্ভবত,' বলল রায়ান। চেয়ার ছেড়ে লাভেটরীর উদ্দেশে রওনা দিল সে।

'তারপর, রানা?' জানতে চাইল চিত্রা। 'তোমার খামার বাড়ির খবর বলো। রকি কেমন আছে?'

'খামার দেখতে যাচ্ছ কবে তোমরা?' বলল রানা, 'কি যে শান্তি পাই ওখানে, বলে বোঝাতে পারব না। রকির সাথেই তো সারাটা দিন কাটাই, ও আমার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আসল মানুষটাই নেই।'

'রেবেকা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সিঙ্গাপুরে কাজ শেষ করতে আরও বেশ ক'দিন লাগবে ওর।'

'ভাল কথা, দাতাকুর কোন খবর পাইনি আমি। তুমি?'

'দেখছি না তো কোথাও!'

'কি মনে হচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল চিত্রা। 'অ্যারেস্ট যে হয়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভেগেছে?'

'বিশ্বাস করি না। আছে কোথাও।'

রানার দিকে চেয়ে রইল চিত্রা, 'কি করবে এখন, ভেবেছ কিছু?'

'আমি?' রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার করার কিছু আছে? কি জানি!'

চিত্রা কিছু বলতে যাবে এসময় লাউড স্পীকার সজীব হয়ে উঠল: 'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মিস অনূঢ়া বৈভব আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে আমাদের আজকের এই বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে হচ্ছে। আগামীকাল…'

নিঝুম খামার-বাড়ি।

পাইন গাছের পালিশ করা কাঠের দোতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে রানা। হাতে হুইস্কি ভর্তি একটা গ্লাস। পশ্চিম দিকে চেয়ে আছে ও। বনভূমির ফাঁক-ফোকর দিয়ে মদ তৈরি করার কারখানাটা দেখা যাচ্ছে।

সামনে বাগান। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পাঁচিলের বাইরে একশো বিঘা জমির ওপর মাথায় সবুজ পালক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লালচে আর হলুদ আখগাছগুলো। পুবে কলাপাতার সমুদ্র, গাছগুলোয় এখনও কলা ধরেনি। দক্ষিণে কংক্রিটের বিশাল চাতাল, খেত থেকে তুলে নিয়ে এসে ফেলা হয় এখানে কফি বীন। আরও পেছনে গম খেত।

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নিচু টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। রেলিঙে ভর দিয়ে চারদিক দেখে নিল একবার। দাতাকুকে নিয়ে অস্বস্তিটা এখনও দূর

হয়নি। ওর সন্দেহ, এখানে এই খামার বাড়িতেও সে আসবে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। ঝুলবারান্দা থেকে সিটিংরুমে ঢুকল ও। বুট জোড়া পরে বেরিয়ে এল করিডরে। সিঁড়ি বেয়ে হলরুমে, সেখান থেকে বাগানের পথ ধরে আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বাগানটা রেবেকার বড় প্রিয়। ফুলগাছগুলো বাতাসে দুলছে। শিস দিয়ে উঠল রানা, অমনি ঘেউ ঘেউ করে উঠল রকি, লাফ দিয়ে বেড়ার পাঁচিল টপকে রানার সামনে এসে দাঁড়াল।

জিভ বের করে রানার বুট জোড়া এখন চাটছে রকি। রানা পিছিয়ে যেতেই লেজ নাড়তে নাড়তে সামনের দুটো নোংরা পা তুলে দিল গায়ের উপর। পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মুখটা যথাসম্ভব ওপর দিকে তুলতে চেষ্টা করছে সে। জিভটা বের করে আছে, রানার মুখ চেটে আদর জানাবার ইচ্ছা।

মাথায় একটা চাঁটি মেরে ধমক লাগাল রানা। 'হয়েছে, হয়েছে। নাম এবার।' সামনের পা দুটো ধরে গা থেকে সরিয়ে দিল রানা। বিলি, এগারো বছরের কিশোর, ছুটে আসছে বাগানের গেট পেরিয়ে।

সামনে এসে দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল বিলি। ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, মাথায় চেপে বসা কালো রঙের টুপি যেন। গলায় ঝুলছে লোহার একটা চেন।

'রকি, কাম হিয়ার!' আদেশের সুরে বলল বিলি। রানার দিকে তাকাল, 'আমার কোন কথাই শুনছে না, স্যার। ওকে একটু বলে দিন, শুয়োরগুলোর পেছনে ফের যদি লাগে, ওর সঙ্গে আমার একচোট হয়ে যাবে।'

হাঁটু গেড়ে বসল রানা। দু'হাত দিয়ে রকির মুখটা ধরল। চোখ বড় বড় করে তাকাল রকির চোখে। 'শুনলি তো, কি বলল বিলি? শুয়োরগুলোর পেছনে লাগা চলবে না। বিলি তাহলে ঝগড়া করবে তোর সঙ্গে।'

'ঘেউ!' ভরাট গলায় হাঁক ছাড়ল রকি। সম্ভবত শুয়োরগুলোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানাল সে। রানা মুখটা ছেড়ে দিতেই রকির গলায় চেন পরিয়ে দিল বিলি।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে, আজ আর ওকে নিয়ে যাচ্ছি না, বিলি! তোমরা খেলা করো।' পা বাড়াতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল রকি। কিন্তু চেনে টান পড়ায় আর এগোতে পারল না।

বিলি দু'হাত দিয়ে টানছে চেনটা।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। হাত নাড়ল রকির উদ্দেশে, তারপর হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।

পায়ের শব্দ পেয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল জন।

'লাগাম জুড়েছ অ্যারোর পিঠে, জন?'

'জ্বী,' প্রৌঢ় নিগ্রো সাদা দাঁত বের করে হাসল। 'রকি আজ সঙ্গে যাবে,

স্যার?'

'না, ফিরতে সন্ধ্যা হতে পারে, তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি না।' বলল রানা, 'বিলির সঙ্গে খেলছে ও।' জনের একমাত্র সন্তান বিলি। কিন্তু সে তা স্বীকার করে না। অ্যারোকেও নিজের আরেকটা ছেলে বলে দাবি করে সে।

আস্তাবল থেকে অ্যারোকে বের করে আনল জন। রানা ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতেই লাগাম ধরিয়ে দিল সে।

পাদানিতে ডান পা ঢুকিয়ে বাঁ পা দিয়ে অ্যারোর পেটে খোঁচা মারল রানা। একবার গা ঝাড়া দিল অ্যারো, তারপর ছুটতে শুরু করল। চকচক করছে ঝদামী গা, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে তীরের মত উড়ে যাচ্ছে যেন। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জন। গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। নিজের হাতে এত বড়টি করেছে সে অ্যারোকে।

এই সময়টা রোজ পাহাড়ে ওঠা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে রানার। সূর্যাস্ত না দেখলে ডিনারটা যেন বিস্বাদ লাগে মুখে।

পাহাড় থেকে নেমে ফেরার পথে দু'নম্বর গেটটা দিয়ে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছোটাল রানা। ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ আছে গ্রামের শেষ মাথায়, মাঝেমধ্যে এখানে ঢুকে গল্প-গুজব করে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে। ছোট্ট গ্রাম, অল্প লোকজন, ইতোমধ্যে সকলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে ও। সহজ গ্রামবাসীরা ওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর সমীহ করে।

রেস্তোরাঁয় ওর ট্রাক্টর ড্রাইভার নিকির সঙ্গে দেখা। 'হাউজ-কীপার আপনাকে খুঁজছিল খানিক আগে, স্যার, কে যেন দেখা করতে এসেছে শহর থেকে।'

লোকটা কে তা অবশ্য বলতে পারল না নিকি। তবে, একটা স্পোর্টস কারকে এক নম্বর গেটের দিকে যেতে দেখেছে সে। গল্প করা হলো না আর। ঘোড়ায় চড়ে দু'নম্বর গেট দিয়ে খামার বাড়িতে ঢুকল রানা।

হাউজ-কীপার মিসেস টেরেলকে হলরুমেই পেল ও। 'এক ভদ্রলোক এসে ফিরে গেছেন, স্যার।'

'রকিকে নিয়ে বিলি ফিরেছে কিনা জানো?'

'আপনাকে খুঁজছিল বিলি, না পেয়ে এইমাত্র বাগানের দিকে ছুটে গেল। ডেকে দেব, স্যার? রকিকে দেখিনি, তবে ডাকাডাকি করছিল খানিক আগে।'

'বিলিকে দেখতে পেলে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ো,' বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানা।

রুমে ঢুকেই রাইটিং টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা এনভেলাপটা দেখতে পেল ও। বুট জোড়া খুলে স্লিপার পায়ে গলিয়ে বসল চেয়ারে। পেপার-ওয়েট সরিয়ে হাতে নিল এনভেলাপটা। উল্টেপাল্টে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। কে? নাম লেখেনি কেন?

এনভেলাপটা খুলতেই ভিতরে দেখা গেল ছাপা একটুকরো কাগজ। আঙুলে ধরে সেটা বের করে অবাকই হলো রানা। পেপার কাটিং!

এনভেলাপটা রেখে দিয়ে পেপার কাটিংটায় মনোযোগ দিল ও। বড় বড় টাইপের হেডিংটা পড়তেই অদ্ভুত এক শিহরণ অনুভব করল:

প্রখ্যাত নর্তকী অনূঢ়া বৈভবের রহস্যজনক মৃত্যু!

হেডিংয়ের নিচে ছাপা হয়েছে পুরো খবরটা এইভাবে: 'সিঙ্গাপুর থেকে আগত প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অনূঢ়া বৈভব গতকাল সকাল দশটার সময় হোটেল স্যাভয়ের পাঁচতলায় অবস্থিত তাঁর রুমের জানালা দিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই মৃত্যু যেমন মর্মান্তিক, তেমনি রহস্যময়। এখানে উল্লেখ্য যে, মাত্র গত পরশু অনূঢ়া বৈভব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অনূঢ়া বৈভবের স্বামী, স্যামূয়েল হার্পার, যিনি একজন মার্কিন নাগরিক, আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, তাঁর স্ত্রী আগের রাতে হোটেল প্রিমিয়ারের প্রদর্শনী শেষ না করেই শারীরিক অসুস্থতাহেতু হোটেল স্যাভয়ে ফিরে আসেন। পরদিন সকালে তিনি যখন বিশেষ একটি কাজে হোটেল ত্যাগ করেন তখন তাঁর স্ত্রী বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন। হোটেলের দারোয়ানের কাছে থেকে জানা গেছে, মি. হার্পার হোটেল ত্যাগ করার আধ ঘণ্টা পর প্রচণ্ড শব্দে অনূঢ়া বৈভব গেটের সামনের রাস্তায় ভূপাতিত হন। অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের সংবাদদাতাকে হোটেলের লিফট অপারেটর জানান, অনূঢ়া বৈভব জানালা দিয়ে নিচে পড়ার মিনিট বিশেক আগে সবুজ স্যুট পরিহিত এক ব্যক্তিকে তিনি পাঁচতলায় পৌছে দিয়েছেন। অনূঢ়া বৈভবকে ঘিরে যখন ভিড় জমে উঠেছে রাস্তায় তখন সেই লোককে লিফটের উক্ত অপারেটর দ্বিতীয়বার দেখতে পান, অনূঢ়া বৈভব বা ভিড়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় লোকটি। অপারেটরের বক্তব্য, লোকটি হোটেলের বোর্ডার নয়।

পুলিস ইন্সপেক্টরের বক্তব্য...'

রানার বাঁ চোখের পাশ থেকে একটা শিরা কাঁপতে শুরু করেই থেমে গেল। জড় পদার্থের মত বসে রইল ও। সবুজ স্যুট পরা অবস্থাতেই দাতাকুকে পুয়ের্টোরিকোয় প্রথম দেখেছে ও।

হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, রুমে ও একা নয়।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাতের পেপার কাটিংটার ওপর দৃষ্টি

ফিরিয়ে আনল রানা। মনে পড়ে যেতেই এনভেলাপটা তুলে নিল আবার। উপুড় করে ঝাঁকুনি দিতেই সাদা একটুকরো কাগজ পড়ল টেবিলে। তার উল্টো পিঠে কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে:

রানা, তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। আবার হয়তো আসতাম কিন্তু আজকের ফ্লাইটেই রওনা হয়ে যেতে হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে। সিঙ্গাপুরে তোমার রেবেকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, বিচিত্র কি! আশা করছি ওখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।– থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত।

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা। তারপর ডেস্কের দিকে এগোল। ডেস্কে উঠে বসেই ক্রাডল থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভারটা।

কিংস্টন এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ দুঃখের সাথে জানাল, পূর্ব এশিয়ার আজকের ফ্লাইটের কোন টিকেট পাওয়া যাবে না, রানাকে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ফ্লাইটের জন্যে, আগামীকাল পর্যন্ত। প্লেন চার্টার করতে চাইল রানা। কর্তৃপক্ষ জানাল, হ্যাঙ্গারে একটা পুরানো ফকার আছে, সেটা দিয়ে যদি কাজ চালানো যায়···রাজি হয়ে গেল রানা। বারবার ফুয়েল নেয়ার জন্যে নামতে হবে জেনেও রাজি না হয়ে কিছু করার নেই ওর।

দাতাকুর নজর পড়েছে রেবেকার ওপর। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত সিটিংরুমের মেঝেতে কিছুক্ষণ পায়চারি করল রানা। এর একটা বিহিত না করলেই নয়। লোকটা ওকে ভীতু আর কাপুরুষ ধরে নিয়েছে। চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরে নেমেই রেবেকার কাছে যাবে দাতাকু! কথাটা মনে হতেই তীব্র ক্রোধে কেঁপে গেল ও। রেবেকাকে ফোন করে সাবধান করে দেয়া দরকার। সিঙ্গাপুরে ওর বন্ধু ব্যারিস্টার জোহর কায়ান রয়েছেন, তাঁকেও জানানো দরকার খবরটা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিলি। দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নার দমকে। 'কি হয়েছে, বিলি?' সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাত দিয়ে চিবুক ধরে মুখটা তুলতে চেষ্টা করল ওপর দিকে। 'কাঁদছ কেন? মিসেস টেরেল বকেছে বুঝি?'

চোখ থেকে হাত নামাল বিলি। কিন্তু চোখের পানি অনর্গল ধারায় তখনও নেমে আসছে। কথা যে বলবে, সে শক্তি নেই, ছোট্ট কালো হাতটা দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে রানার একটা কব্জি, টেনে নিয়ে চলল বাইরে।

করিডর, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে হলরুম, তারপর হলরুম থেকে সোজা বাগানে।

বুক ভরে তাজা বাতাস ফুসফুসে ভরে নিল রানা। রেবেকার কথা মনে

পড়ে গেল। মাস খানেকও হয়নি, এইরকম তারা-জ্বলা আকাশের নিচে এই বাগানে ছুটোছুটি করতে করতে চারদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছিল রেবেকা তার সুরেলা হাসি দিয়ে। আর ক'টা দিনের প্রতীক্ষা মাত্র, রেবেকাকে ফিরিয়ে আনবে ও। হঠাৎ বিয়েটা সেরে ফেলার একটা তাড়া অনুভব করল রানা।

মুখ বুজে মাথা নিচু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিলি রানাকে। গোলাপ-ঝাড়ের কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রানার দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর অদম্য শোক সামলাতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রকির মৃত চোখ জোড়ার দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে পেছন দিকে। আবছা আলোয় ফুলগাছগুলোকে দুমড়েমুচড়ে হেলে থাকতে দেখতে পাচ্ছে রানা। ঘাসের ওপর টানাহেঁচড়ার দাগ গভীর হয়ে ফুটে রয়েছে। রকির সাদা-কালো লোমগুলো জটা পাকিয়ে গেছে শুকনো রক্তের সঙ্গে। ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে না। দেখার চেষ্টাও করল না রানা। 'রকি!' মৃদু শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলার ভেতর থেকে, পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল ও। বিলির হাত ধরে বাগানের গেটের দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

কথা রেখেছে দাতাকু। জায়গা মত খোঁচা দিতে শুরু করেছে সে।

পাঁচ

সিঙ্গাপুর। চারশো উনত্রিশ, বুকিট তিমাহ রোড, হোটেল ইকুয়্যাটোরিয়াল। ঠক, ঠক! নক করল কেউ।

দরজা খুলে দিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রেবেকা। হাসিতে উজ্জ্বল তাজা ফুলের মত মুখ।

'মিস রেবেকা?'

'জ্বী।'

'ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবেন কি? আমি একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি।'

দপ করে নিভে গেল হাসিটা। 'মেসেজ? কার মেসেজ?'

'আমার,' দাতাকু বলল। 'আমার নাম থাইপুজম দাতাকু...'

এক পা পিছিয়ে গেল রেবেকা। হাত উঠে গেল ঠোঁটের ওপর, ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল দ্রুত। তারপর দাতাকুর দিকে ফিরে বলল, 'কি দরকার আমার কাছে?'

'আপনি জানেন না,' বলল দাতাকু, 'কিন্তু আপনার জীবনে আমি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনাকে কিছু বলব বলে কয়েক হাজার মাইল দূর

থেকে ছুটে এসেছি, শুনতে না চাইলে পরে পস্তাবেন।'

পিছিয়ে গিয়ে পথ করে দিল রেবেকা। পেছন দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'কাশমা!'

রেবেকার পাশ ঘেঁষে সিটিংরূমের ভেতর ঢুকল দাতাকু।

ক'পা এগিয়ে হাত দশেক দূরত্ব বজায় রেখে একটা চেয়ারে বসল রেবেকা। ঘাড় ফিরিয়ে দাতাকু দেখল সতেরো-আঠারো বছরের একটা স্থানীয় মেয়ে পাশের কামরার দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। 'অতিথিসেবা বলে একটা কথা আছে, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'কাশমা, কোল্ড ড্রিঙ্ক...'

'থাক, থাক,' দাতাকু সহাস্যে বলল। 'কোল্ডের ভক্ত নই আমি। অবশ্য আপনার তা জানার কথা নয়। রানা জানে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি হট পছন্দ করি। সে যাক,' কাশমার দিকে ইঙ্গিত করল সে চোখের ওপরের রোমহীন মাংস নাচিয়ে, 'আপনার পরিচারিকা কি ইংরেজি জানে?'

বিরক্তি চেপে রেবেকা বলল, 'আমার সময় খুব কম। সংক্ষেপে বলবেন দয়া করে—কি চান আপনি?'

'সবচেয়ে আগে বলতে চাই, আমার বন্ধু মাসুদ রানার সৌন্দর্যবোধের কোন তুলনা হয় না। আপনি এমন সুন্দরী, বিশ্বাস করুন, কল্পনাও করিনি।'

নিজেকে দমন করতে পারল না রেবেকা। 'বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। কি চান, তাই বলুন।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে।

'সরি, নো অফেন্স!' দাতাকু সিগারেট বের করে ধরাল। 'রানাকে কখন আশা করছেন আপনি?'

'আগামীকালই...না...তা আপনাকে আমি বলতে যাব কেন?'

সাদা দাঁত বের করে হাসল দাতাকু। 'বিয়েটা কবে হচ্ছে আপনাদের?...না, মানে, বিয়ে তো হবেই না—আমি জানতে চাইছি, আপনারা কবে নাগাদ বিয়ে করবেন বলে ভেবেছেন?'

'কি বললেন? বিয়ে হবে না? তার মানে?'

'মানে অতি সহজ,' বলল দাতাকু, 'আমি চাই রানার সাথে আপনার বিয়েটা যেন না হয়। চেঁচামেচি করার আগে একটা কথা মনে রাখুন, আপনার ভালর জন্যেই বলছি, রানাকে বিয়ে করলে আপনি রানারই চরম ক্ষতি করবেন। রানার ক্ষতি হোক তা কি আপনি চান?'

লোকটার ধৃষ্টতা দেখে থ হয়ে গেল রেবেকা।

'রানা সিঙ্গাপুরে পা দিয়েই বিয়ের কথা পাড়বে। আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। মুখের ওপর বলে দেবেন—না।'

দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ব্যাপারটা। এরকম বিদঘুটে ঘটনা ঘটতে দেখেও যেন চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রেবেকা। ভাষা না বুঝলেও

দাতাকুর হাবভাব দেখে বিপদ আঁচ করতে পেরেছে কাশমা। নিঃশব্দ পায়ে রেবেকার পেছনে এসে দাঁড়াল সে।

রেবেকার দিকে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে দাতাকুর। হাসি নেই মুখে। চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল একবার। নিচের পাটির দাঁত ওপরের পাটিকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে সামনের দিকে। 'যা বলছি বুঝতে পারছেন?' চাপা কণ্ঠে হিসহিস করে উঠল দাতাকু, 'রানাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেবেন আপনি তাকে বিয়ে করবেন না। কারণ জানতে চাইলে মিছে অজুহাত দেখাবেন, আসল কারণটা তাকে বলবেন না।'

'আসল কারণ?' অস্ফুটে জানতে চাইল রেবেকা।

'আমি নিষেধ করেছি তা যেন না জানে সে। তাকে বলবেন না, আমার ভয়ে আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজি নন।'

'আপনার ভয়ে?'

'হ্যাঁ,' দাতাকুর কঠিন জবাবটা গমগম করে উঠল রূমের ভিতর, 'ভয়ঙ্কর লোক আমি, আমাকে ভয় পেলেই আপনি রানার ভাল করবেন।'

'আপনি উন্মাদ! হাস্যকর কথা বলছেন, মি. দাতাকু, প্রলাপ শোনার ধৈর্য নেই আমার। দয়া করে আপনি এবার আসুন।'

অলস ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দাতাকু। 'আমাকে পাগল ভাবলে কোন লাভই হবে না, মিস রেবেকা। আমি আপনার ভালর জন্যেই কথাগুলো বলছি। গ্রহণ করা না করা আপনার অভিরুচি। আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করা দরকার। শুনুন, রানাকে যদি বিয়ে করতে রাজি হন, সে খুন হবে আমার হাতে। দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিত জেনে রাখুন। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি, রানা নিজেই তার সাক্ষ্য দেবে। আমি চাই, আপনার সাথে আমার আজকের এই দেখা হওয়ার ঘটনাটা যেন রানা জানতে না পারে। তাকে আপনি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে।'

'কিন্তু কেন। কেন? কেন আপনি...?'

'কেন রানাকে বিয়ে করতে দিতে চাই না?' ভারী গলায় বলল দাতাকু, 'আমার যুক্তিটা অখণ্ডনীয়, মিস রেবেকা। শুনুন তাহলে। রানার জন্যে আমার প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। আমার এই দুঃখ বর্ণনা করতে পারি তেমন ভাষাও আমার জানা নেই। এ দুঃখ কোনদিন ভোলারও নয়। খানিকটা লাঘব হবে, যদি এর জন্যে যে লোকটা দায়ী তাকে বিয়ে করতে না দিই। বুঝতে পেরেছেন?' ঘুরে দাঁড়াল দাতাকু। ধীর ভঙ্গিতে এগোল দরজার দিকে। দরজার সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল সে আবার। 'এখন থেকে রানার জীবন আপনার হাতের মুঠোয়। তাকে যদি বাঁচাতে চান, বিয়ে করতে অস্বীকার করুন। আবার হয়তো দেখা হবে। কিন্তু তা আমি চাই না। বিদায়।'

দরজা খুলল দাতাকু. ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।
মুখ তুলে তাকাল রেবেকা কাশমার দিকে।
কাশমা দেখল. ওর দু'চোখে আতঙ্ক আর উদ্বেগের ছায়া।

সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট।

চোখে সানগ্লাস পরতে পরতে ফকারের পেট থেকে একা নেমে এল রানা টারমাকে। চারদিকে প্রচণ্ড রোদের দাপট। দূর থেকেই চোখ দুটো খুঁজছে রেবেকাকে।

অফিশিয়াল ঝামেলা চুকিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। সদ্য দৌড় শেষ করা ঘোড়ার মত দরদর করে ঘামছে ও। বুকের ভিতর ধুকধুক করছে হৃৎপিণ্ড। কোথায় রেবেকা?

রেবেকা রিসেপশনে নেই, লাউঞ্জেও নেই। বাইরে এসে পার্কিং লটেও ক্রিমসন কালারের মার্সিডিজটাকে দেখতে পেল না রানা। অথচ কলম্বো থেকে ফোন করে পৌছুবার সময় জানিয়েছে সে রেবেকাকে, এয়ারপোর্টে থাকার কথা তার। অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল বুকটা…কিন্তু না, হতে পারে না। ফোন বুদে ঢুকল ও।

ডায়াল করতে হোটেল ইকুয়্যাটোরিয়ালের অপারেটর রেবেকার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল। 'রেবেকা, আমি রানা, এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। কোন বিপদ ঘটেছে?'

কোন উত্তর নেই তিন সেকেন্ড। শিরশির করে উঠল সর্বশরীর। কিছু বলতে গেল আবার রানা, এমন সময় রেবেকার কণ্ঠস্বর ভেসে এল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। শান্ত, নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর। 'না, বিপদ-টিপদ কিছু নয়। হঠাৎ একটা কাজে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। দেরি হয়ে গেছে দেখে এয়ারপোর্টে যাইনি আমি। সোজা এখানেই আসছ তুমি, রানা?'

'তার মানে?'

বুঝল না রানা। কার সঙ্গে কথা বলছে ও? রেবেকা এমন ঠাণ্ডা কেন? যেন খুশি হয়নি। সিঙ্গাপুরে নেমে কোথায় উঠবে তাও কি জিজ্ঞেস করার মত একটা প্রশ্ন? এক সাথে হোটেলেই তো ছিল ওরা এর আগে।

কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, বুঝে নিল রানা। কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে যার জন্যে ওর প্রতি এমন শীতল ব্যবহার করছে রেবেকা? কিংস্টন থেকে যখন ও ফোন করে সাবধান করে দেয় দাতাকু সম্পর্কে তখন তো রেবেকাকে এরকম মনে হয়নি!

'না, মানে,' রেবেকা কথা বলতে শুরু করল আবার। 'তোমার বন্ধু মি. জোহর কায়ানের বাড়িতে ইচ্ছে করলে উঠতে পারো, তিনি বলছিলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি কি করবে ঠিক জানি না বলে তোমার জন্যে এক্সট্রা

রুম ভাড়া নিইনি।'

ফোনে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল রানা। রেবেকার সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে কিছুই বোঝা যাবে না। 'আমি আসছি...'

'এক মিনিট, রানা,' বলল রেবেকা। 'কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছুতে পারবে তুমি? আমাদের ফার্মটা বিক্রি করার ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা হবে, পার্টিরা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, হাতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। কখন ফিরব তাও বলতে পারছি না। কাল সকালের দিকে তোমার সাথে বেশ খানিকটা সময় কাটাতে পারব, আশা করছি...'

কিছু একটা অনুমান করতে পারল রানা, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি, এর মধ্যে কোথাও বেরিয়ো না।' রেবেকাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে রিসিভার রেখে বুদ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ও।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ট্যাক্সি। বিনাবাক্যব্যয়ে নিজেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। 'হোটেল ইকুয়্যাটোরিয়াল। কুইক!'

ঠক, ঠক! নক করে ধৈর্য ধরতে পারল না রানা। 'রেবেকা! রেবেকা, দরজা খোলো!'

রেবেকা নয়, কাশমা খুলে দিল দরজা। 'মেমসাব বাথরুমে, স্যার।'

কাশমার কথা শুনল কি শুনল না, হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল রানা। সিটিংরুম পেরিয়ে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ও।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা খোলা, কেউ নেই সেখানে। পায়ের আওয়াজ পেয়েছে রেবেকা, ভাবল রানা, তবু ফিরছে না তার দিকে। ইচ্ছা হলো ছুটে যায়, কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের অভিমান উথলে উঠল বুকের ভিতর।

নিঃশব্দে রুমের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ দুটো রেবেকার ঘাড়ের ওপর স্থির। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা, একটু আড়াআড়ি ভাবে, একটা হাত জানালার শার্সিতে। আঙুল দিয়ে কি সব দাগ কাটছে সে।

স্যামসনয়েড সুটকেসটা বিছানার ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল রানা। আবার তাকাল রেবেকার দিকে। হাত দুটো আপনাআপনি মুষ্টিবদ্ধ হওয়ার সময় অনুভব করল ও, তালু দুটো ঘেমে গেছে। 'রেবেকা?'

গায়ে যেন জোর নেই, মনে নেই উৎসাহ, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রেবেকা। 'এসে গেছ! আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আরও নিচু গলায় বলল রানা, উৎকণ্ঠা চেপে রাখার জন্যে। 'কি হয়েছে তোমার?' ইচ্ছা হলো এগিয়ে গিয়ে রেবেকার মুখোমুখি দাঁড়ায়, কিন্তু অদ্ভুত একটা অস্বস্তি আর অভিমান জোর করে দাঁড়

করিয়ে রাখল ওকে রুমের মাঝখানে।

'কি হবে, কিছুই হয়নি,' চোখের পানি লুকোবার জন্যে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রেবেকা। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল, 'শাওয়ারটা সেরে নিই আমি, তুমি বসো।'

'রেবেকা, দাঁড়াও!' বলল রানা। 'দাতাকু...'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না রানা, রেবেকা বলল, 'না।'

আগেই সন্দেহ করেছিল রানা। রেবেকার এই উত্তরেই সব সন্দেহের নিরসন হলো। এসেছিল দাতাকু।

ক্লান্ত পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রেবেকা। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার ওপরের অংশটায় কাঁচ, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা রেবেকার ঘাড় আর পিঠের খানিকটা। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, নড়ল না রেবেকা। তারপর হাত দুটো পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে ব্লাউজের হুক খুলতে শুরু করল সে।

উন্মুক্ত পিঠ দেখা গেল রেবেকার। নিচু হলো সে, কাঁচের ওধারে তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখা গেল না। তারপর আবার সিধে হয়ে একপা এগিয়ে শাওয়ারটা খুলে দিয়ে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও সে রানার দিকে পিছন ফিরে।

রেবেকাকে দেখছে রানা, এমন সময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে চমকে উঠল ও। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। কি যেন ভাবল একমুহূর্ত। তারপর ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল রিসিভারটা। 'হ্যালো!'

'সেলামাত দাতাং!' মালয়ান কায়দায় শুভেচ্ছা জানাল দাতাকু, 'আশা করি মধুর কোন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি না, রানা?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজনবোধ করল না রানা।

'মিস রেবেকার রূপগুণের বর্ণনা পেয়েছি আমি,' বলল দাতাকু। 'এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাপার। ঠিক যেন সকাল বেলার তাজা গোলাপের ওপর দু'ফোঁটা শিশির।'

এবারও সাড়া দিল না রানা।

'লাইনে আছ, রানা?'

'আছি।' কাঁচ ভেদ করে চলে গেছে রানার দৃষ্টি বাথরুমে।

'একটা বিশেষ কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বন্ধু। একটা ব্যাপার ভুলে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছ তুমি। ব্যাপারটা বেশিরভাগ মানুষই ভুলে থাকতে চায়, ভুলে থাকতে চায় যে মৃত্যু সব সময় আমাদের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা করে আছে। কখনও সে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করে, আবার কখনও সে দু'মিনিটও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না।'

'এসব কথার অর্থ কি তোমার?'

'মৃত্যু।'

'তোমার নয়তো?' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা সশব্দে।

খুট্ করে একটা শব্দ হতে মুখ তুলতে যাবে, তার আগেই তীরবেগে ছুটে এসে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবেকা।

'রেবেকা!'

বিছানায় পড়ল রেবেকা রানাকে নিয়ে। ওর গায়ের পানি ভিজিয়ে দিল রানার হাত, চোখমুখ। উন্মাদের মত চুমো খাচ্ছে ও রানার কপালে, গালে, ঠোঁটে। রেবেকার চোখের নোনাপানির স্বাদ পাচ্ছে রানা ঠোঁটে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশে নামিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢাকা দিল রানা রেবেকাকে, 'এই, কি হচ্ছে এসব...'

অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল রেবেকা। রানার বুকে মুখ ঘষছে, মাথা কুটছে অবিরত। 'রানা। দাতাকু! দাতাকু তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চায় আমার কাছ থেকে।'

কঠোর মুখ তুলে তাকাল রানা দেয়ালের দিকে। 'তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, রেবেকা!'

রানার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, স্থির হয়ে গেল রেবেকা। রানার মুখটা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে ফেরাল সে। 'সত্যি বলছ? সত্যি...'

'আমাদের সুখের পথে কাউকে বাদ সাধতে দেব না, রেবেকা। সে যেই হোক!'

লাল, হলুদ আর বেগুনী রঙের সিল্কের ছিট কাপড়ের কিমোনোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে রেবেকাকে। রানার মুগ্ধদৃষ্টি অনুভব করে লজ্জা পেল ও, নাকের দু'পাশে গাল লাল হলো একটু। কাশমা ট্রে রেখে গেল। তাড়াতাড়ি পট থেকে দুটো কাপে দুধ চিনি আর কফি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেবেকা।

মুখে হাসির ছোঁয়া, কিন্তু মনের ভিতর গুমোট একটা ভাব। কোনমতেই স্বস্তি আনতে পারছে না রানা। মুখে যাই বলুক, ও মানে, দাতাকুকে আঘাত করার মানসিকতা এই মুহূর্তে অন্তত নেই ওর। একবার ভুল করেছে ও, দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায় না।

'সব বলো আমাকে, রানা,' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখল রেবেকা। 'বিপদ আসলে কতটা ভয়ঙ্কর?'

প্রথমে দাতাকুর পরিচয়, তারপর নিজের ভুলটা ব্যাখ্যা করল রানা। পুয়ের্টোরিকো থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, কিছুই বাদ রাখল না বলতে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল রেবেকার মুখের হাসি। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল কপালে। সবশেষে রানা বলল, 'রকিকে খুন করে আঘাত করেছে দাতাকু আমাকে। এই তার সূচনা, এখন থেকে সে সরাসরিই আঘাত করতে চেষ্টা

করবে। আমার প্রিয় যারা তাদেরকে…কষ্ট দেবে সে।' খুন শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে রানা।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'আমাকে সুখী করতে যাচ্ছ তুমি,' বলল রানা। 'তার মানে, তুমিই এখন তার প্রধান লক্ষ্যস্থল। আমার জীবনে তুমি কতটুকু স্থান দখল করে রেখেছ, যেভাবে হোক জানতে পেরেছে ও। এখন আমাদের মধ্যে সে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইবে।'

'ওর সম্পর্কে যা বললে শুনে মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই ওর। পাঁচ বছর জেল খেটে বাইরে বেরিয়ে নিজেকে একা, নিঃসঙ্গ দেখতে পাচ্ছে সে। তোমাকেই শুধু চেনে। সেই জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনের একমাত্র যোগসূত্র তুমি। সেক্ষেত্রে, মুখে যাই বলুক, তোমাকে ও খুন করতে পারবে না!'

'কিন্তু…কিন্তু'…কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হলো না রানার।

'হ্যাঁ,' বলল রেবেকা, 'সে হয়তো আমাকে…আমার ওপর আঘাত করতে চেষ্টা করবে। রানা, আমি চাই বিয়েটা দু'চার দিনের মধ্যে হয়ে যাক আমাদের।'

'তোমাকে সে অসুখী দেখতে চায়,' বোঝাবার ভঙ্গিতে আবার বলল রেবেকা, 'তাই চাইছে তোমাকে যেন আমি বিয়ে না করি। তাই আমাদের বিয়ে করাই উচিত।'

বিপদটা নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে রেবেকা, বুঝতে পারল রানা। বিয়ে করে দাতাকুর দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইছে ও, যাতে রানার দিক থেকে সে মনোযোগ হারায়।

'বেশ,' বলল রানা, 'কিন্তু বিয়েটা গোপনে হোক, এই আমি চাই, রেবেকা। দাতাকু যেন জানতে না পারে।'

'কেন? জানলে কি হবে? তোমাকে ও খুন করার চেষ্টা কোনদিনই করবে না, এ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আমাকে হয়তো..কিন্তু আমাকে রক্ষা করার জন্য তুমি তো রয়েছই।'

বড় বেশি ভরসা করছে রেবেকা ওর ওপর, অনুভব করল রানা।

কিন্তু এ বিপদের সঙ্গে অন্য বিপদের তুলনা হয় না কোনভাবেই। দাতাকুর বেলায় সমস্যাটা অন্যরকম, বাধ্য না হলে পাল্টা আঘাত হানতে রাজি নয় ও।

কিন্তু বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাও হবে চূড়ান্ত বোকামি। এর মধ্যে এমন কিছু হারাতে পারে ও যা হয়তো কোনদিন আর ফিরে পাওয়ার নয়।

ছয়

রেবেকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পায়রা কায়ান চুমু খেল একটা।

'কংগ্র্যাচুলেশনস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড!' জোহর কায়ান সজোরে মুচড়ে দিল রানার হাতটা করমর্দন করার সময়। 'আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, কোন মেয়ে কামান দেগে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি না দেওয়া পর্যন্ত বিয়েতে তুমি রাজি হবে না।' রানার কাঁধে হাত রেখে সোফার দিকে টেনে নিয়ে চলল সে, 'বসো, রানা। অনেকদিন পর পেয়েছি তোমাকে, সহজে ছাড়ছি না।'

শহর থেকে দূরে, পাহাড়ের ওপর জোহর কায়ানের মনোরম বাড়ি।

সোফায় বসে হেলান দিল রানা। উদ্বেগহীন।

রেবেকাকে পাশে নিয়ে আরেক সোফায় বসল পায়রা। শালিক পাখির মত কিচিরমিচির থামছেই না তার। 'ডেট ঠিক হয়েছে? আরে, অমন হাঁ করে আছ কেন? বিয়ে, বিয়ের ডেট জানতে চাইছি। কবে? হানিমুন করতে যাচ্ছ কোথায়?'

'ও বলছে ইন্দোনেশিয়ায় যাবে, বালিতে,' আঙুল দিয়ে কপালে পড়া একগোছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলল রেবেকা। 'কিন্তু আমরা এই চারজন ছাড়া বিয়ের কথা আর কাউকে জানাতে চাইছে না ও।'

'কেনাকাটা সারা হয়েছে?'

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রানা আর কায়ানকে রেখে গাড়ি নিয়ে নেমে গেল পায়রা আর রেবেকা। শপিং সেরে ফিরতে কম করেও রাত আটটা। ওরা এলেই আবার বেরুতে হবে, হোটেল রক্সিতে ডিনার রাত ন'টায়। রিস্টওয়াচ দেখল রানা।

কায়ান বলল, 'ইউনুস সাতটার মধ্যে আসছে, ফোন করে জানিয়েছে। খুব নাকি জরুরী ব্যাপারে আলাপ করতে চায় তোমার সঙ্গে।'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সিঙ্গাপুর এজেন্ট ইউনুস বোখারী। ঠোঁট ওল্টাল রানা। 'বাজে কথা। ওদের সঙ্গে নেই আমি।'

'আচ্ছা, রানা,' কায়ান একটু ইতস্তত করে পাড়ল প্রসঙ্গটা, 'দাতাকু সম্পর্কে বলো এবার। তোমার ফোন পেয়ে আমি খবর সংগ্রহের জন্যে লোকজনকে বলে রেখেছি। ঘণ্টাদুয়েক আগে একজন জানিয়েছে, বীচ হোটেলে দেখা গেছে তাকে লাঞ্চ খেতে। রানা, পুলিসের সাহায্য নিতে চাও তুমি?'

'সাহায্য?' অবাক হলো রানা। 'কিসের সাহায্য? দাতাকুকে জব্দ করার

জন্যে? না, কায়ান, ওর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। তাছাড়া, সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি দু'চার দিনের মধ্যে, এখানে কোনরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান কি, ভেবেছ কিছু?'

সেই পুরানো প্রশ্ন! হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হলো রানার। 'জানি না।'

'পাল্টা আঘাত যদি করতে না পারো, বিপদ ঘটবে,' বলল কায়ান। চিন্তিত দেখাল তাকে।

'কিন্তু পাল্টা আঘাত করা আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব?' বলল রানা। 'সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের লোক সে। বেছে বেছে আমার প্রিয় জিনিসগুলোর ওপর আঘাত করছে, এটাই তার পদ্ধতি। ওই পদ্ধতি আমি গ্রহণ করতে পারি না, কায়ান। তাছাড়া, ওর কাছে প্রিয় এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে মনে করি না। একটা জিনিসই আছে ওর, তা হলো, আমার প্রতি চরম ঘৃণা।'

'কেমন মানুষ সে! কোন চুক্তিতে আসাও কি সম্ভব নয়?' বলল কায়ান। 'আমি বলতে চাইছি, ধরো, ফাঁদ পেতে ওকে যদি বিপদে ফেলা যায়, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে যদি সে ভবিষ্যতে তোমাকে বিরক্ত না করার প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিজ্ঞাটা পালন করবে?'

'না।' উত্তরটা দেয়ার পর, বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। কায়ুদানায় একটা ফাঁদ আছে...কিন্তু না, ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তা করা দরকার।

অ্যাশট্রেতে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কায়ান কিছু বলতে যাবে, রানা বলল, 'আমাকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দিয়েছে দাতাকু।'

'দেখো, রানা, শেষ পর্যন্ত ওকে...'

বাধা দিল রানা। বলল, 'আমি খুনী নই, কায়ান। আমি বিচারকও নই।'

'থাই পুলিসের হাতে ওকে তুলে দিতে পারো না?'

'কিভাবে? তারা তো বিশ্বাসই করতে রাজি নয় যে দাতাকু বেঁচে আছে। সে জীবিত, একথা প্রমাণ হলে বেশ কিছু অফিসারের চাকরি যাবে। দাতাকুকে ওরাই পালাবার রাস্তা করে দেবে, গ্রেফতার করা তো দূরের কথা।'

'বেড়ানো শেষ করে কোথায় যাচ্ছ তুমি, কিংস্টনের সেই খামার বাড়িতেই?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না ওর।'

রানা চুপ করে রইল।

'খামার-বাড়িতে আবার যদি ও যায়, কি করবে তুমি?'

চিন্তিতভাবে একটা সিগারেট ধরাল রানা, কথা বলল না।

'ওই খামার-বাড়ি তোমার কাছে কতটা প্রিয়, বুঝতে সময় লাগবে না

ওর,' বলল কায়ান। 'বীমা করিয়েছ খামার-বাড়ির, রানা?'

চমকে উঠল রানা। 'বীমা করা আছে,' অস্ফুটে বলল ও।

'বীমা করা থাকলেও, ক্ষতিপূরণই শুধু হবে তাতে, যেটা হারাবে সেটা আর ফিরে পাবে না। তাছাড়া, কে জানে, খামার-বাড়ির সঙ্গে আরও কি প্রিয় জিনিস হারাবে তুমি।'

'কি করতে বলো তুমি আমাকে?'

'যা তুমি করতে চাইছ না।'

উত্তর না দিয়ে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ঠিক সেই সময় ফ্রন্টডোরের বেল বেজে উঠল।

সোফা ছেড়ে উঠল কায়ান, 'সম্ভবত ইউনুস।' বেরিয়ে গেল সে সিটিংরুম থেকে। দু'জনের আলাপের সময় থাকতে চায় না সামনে।

ইউনুসের কণ্ঠস্বর পেল রানা করিডরে, কথা বলছে কায়ানের সঙ্গে। বছর তিনেক আগে কায়ানের সাথে রানাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার। পরিচয়টা এতদিনে ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে। কায়ানের বাড়িতে রানার মতই অবাধ যাতায়াত ইউনুসের।

'মর শালা, জ্যান্ত পাপ!' রানাকে অভ্যর্থনা জানাল ইউনুস, 'কি যাদু যে করেছিস, সিঙ্গাপুরে আসছিস শুনেই আনন্দে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না, খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ।' দরজা টপকে ছুটে এসে সামনে একটা সোফায় বসল প্রকাণ্ডদেহী ইউনুস। 'হ্যাঁরে, শুনলাম একটা মেয়ে নাকি তোকে ইলোপ করেছে? সত্যি কে সে? কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাল ইউনুস, 'দেখছি না কেন?'

রানা বলল, 'দুঃখিত, পরপুরুষের সামনে এখন যেতে মানা আছে ওর।'

'হোয়াট! কেন? কে মানা…'

'আমি। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নই।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল ইউনুস।

রানা জানতে চাইল, 'তোদের সব খবর কি তাই বল।'

এক পলকে বদলে গেল ইউনুসের চেহারা। রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, খাদে নেমে গেল গলা। মুখটা গম্ভীর। নিজের পায়ের জুতো জোড়ার ডগার দিকে ক'সেকেন্ড চেয়ে রইল, তারপর মুখ তুলল, 'রানা, বন্ধু হিসেবে নয়, আমি অফিশিয়ালি তোর সাথে দেখা করতে এসেছি। ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ কিছুই করতে পারছি না আমি। তোর সাহায্য দরকার।'

বিপদটা যে সত্যি গুরুতর, ইউনুসের বলার ভঙ্গিতেই বুঝল রানা। কিন্তু নির্মম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল ও, 'তোদের অফিসের বিপদ তো আমার কি? এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কি ভেবে? বি.সি.আই-য়ের সঙ্গে আমি নেই, জানিস না?'

'সে তো গুজব…'

'কোন্টা গুজব? বি.বি.আই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?' চাপা ক্রোধের সঙ্গে বলল রানা, 'হতে পারে। কিন্তু বি.সি.আইকে আমি ত্যাগ করেছি। এটা গুজব নয়।'

'এ তোর অভিমানের কথা, রানা,' বলল ইউনুস, 'বিলিভ মি, যে ঘটনাটা ঘটেছে, শুনলেই লাফ দিয়ে উঠবি তুই, অভিমান করে বসে থাকতে পারবি না।'

'প্লীজ, ইউনুস,' বলল রানা, 'অন্য কোন কথা থাকলে বল।'

'রফিকের কোন খবর নেই, রানা,' ইউনুস একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে সে। 'মাস তিনেক হলো নিখোঁজ। আমার ধারণা, রফিক খুন হয়েছে।'

ধড়াস করে উঠল বুকটা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট খুন হয়েছে! মুহূর্তের জন্যে সব ভুলে গেল রানা, শিরা উপশিরায় বেড়ে গেল রক্তের গতি। কিন্তু মুখ দেখে কোন প্রতিক্রিয়ারই হদিস পেল না ইউনুস।

'আমি কি করব?' ইউনুসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'কোথা থেকে নিখোঁজ হয়েছে?' নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল ও, 'জাস্ট কিউরিওসিটি!'

'ওর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ইন্দোনেশিয়ায়,' বলল ইউনুস। 'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল কায়ুদানা দ্বীপে। শেষ মেসেজ পাঠায় ওখান থেকেই: গোটা এলাকার অবস্থা বিস্ফোরণোন্মুখ।'

'অর্থ?'

'আগের মেসেজগুলোর প্রেক্ষিতে সর্বশেষ মেসেজটার অর্থ হলো, রেড ড্রাগন ইন্দোনেশিয়ায় আবার একটা রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটাবার জন্যে তৈরি হতে যাচ্ছে। তুই তো জানিস, রেড ড্রাগনের হেডকোয়ার্টার হলো ছোট্ট একটা দ্বীপ। আমার ধারণা, কায়ুদানাই হচ্ছে সেই দ্বীপ। দেশের কয়েক হাজার দ্বীপ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত রেড ড্রাগনের প্রতিনিধিরা সম্ভবত মিলিত হতে যাচ্ছে ওখানে। গুজব হলো, মিত্রা ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস ত্যাগ করে রেড ড্রাগনের দলে ভিড়েছে।'

'মিত্রা সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?'

'না,' বলল ইউনুস, 'শুধু জানা গেছে তোর খোঁজ করছে সে।'

চিত্রার মুখ থেকে একথা আগেই শুনেছে রানা, সুতরাং এটা কোন খবর নয় ওর কাছে। গোটা ব্যাপারটা ভুলে যেতে চায় ও, এই ভাব দেখাল বটে কিন্তু রফিক নিখোঁজ, হয়তো খুন হয়েছে সে, কোনমতে মন থেকে তাড়াতে পারল না ব্যাপারটা। ও জানে, এই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা তার রিপোর্টে উল্লেখ

করবে ইউনুস, রাহাত খান বেশ খুঁটিয়ে পড়বেন সেটা। ইউনুসকে নিরাশ করার একটা তাগাদা অনুভব করল ও। বি.সি.আই-য়ের বিপদে ওর যে কিছুই এসে যায় না এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে বলল, 'কে নিখোঁজ হয়েছে, কে খুন হয়েছে এসব জানার দরকার নেই আমার। কায়ান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে বাইরে, ওকে ডেকে দিয়ে যাস যাবার সময়।'

এভাবে বিদায় করে দেবে রানা, ভাবতেও পারেনি ইউনুস। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। 'দেখা করিস সময় পেলে...'

'আনঅফিশিয়ালি, যদি সময় পাই,' বলল রানা।

করমর্দন করে বেরিয়ে গেল ইউনুস।

সবুজ সিল্কের ওপর পারদের মত জ্বলজ্বলে সাদা জরির বুটি সেলাই করা গাউন, মাথা আর দু'কাঁধের ওপর কালো একটা নেটের শাল, অসংখ্য দামী পাথর দিয়ে তৈরি একটা ছড়া গলার চারদিকে এঁটে বসে আছে, ঝুরিগুলো কালো নেটের সাথে আটকানো।

রিজার্ভ করা টেবিলে পৌঁছতে তিন মিনিট দেরি হলো পায়রার। সিঙ্গাপুরের অভিজাত সমাজে এমন কেউ নেই যে ওকে চেনে না, ওর সাজপোশাকের ভক্ত নয়। প্রায় প্রতিটি টেবিল থেকে আহ্বান আর অভিনন্দনের বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

নিজের হাতে সাজিয়েছে পায়রা রেবেকাকে। বাঙালী কনের সেই চিরাচরিত সাজ। জামদানী, নাকফুল, টায়রা থেকে শুরু করে তাগা, টিকলি—কোন গয়নাই বাদ রাখতে দেয়নি সে। প্রতিবাদ রানাও করেছিল, কিন্তু পায়রা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে উৎসাহই দিয়েছে সে রেবেকাকে। বলেছে, 'বাংলাদেশীদের নিয়ম, বিয়ের সময় এইভাবে সাজতে হয়।'

টেবিলে এসে বসল পায়রা। রেবেকার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'জ্বী না, লজ্জাবতী কনে, আমাকে সবাই অমন ডাকাডাকি করছিল দেখে ভেবো না যে আমিই ওদের আগ্রহের কারণ। ওরা খুব ভাল করেই জানে, পায়রা কায়ান অন্যের জিনিস। ওরা টাটকা, তাজা ফুলটার কথাই জানতে চাইছিল। বিশ্বাস না হয়, চারদিকে তাকাও। দেখো, সবাই কেমন গিলছে তোমাকে।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল পায়রা।

সব কটা টেবিলে লোকজন ভর্তি। হোটেল রক্সি গভীর রাত পর্যন্ত এইরকম ঠাসা থাকে ধনীর দুলাল আর রূপের দুলালীদের ভিড়ে। হুইস্কি আর শ্যাম্পেনের পালা শেষ করে ডিনারের অর্ডার দেয়া হলো। এমন সময় রানার কানের কাছে ঠোঁট নেড়ে কায়ান বলল, 'এইমাত্র ভেতরে ঢুকল।'

কে? প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝে নিল কার কথা বলছে

কায়ান। মুখ তুলতেই তাকে দেখতে পেল ও।

দাতাকুর সঙ্গের লোকটাই আগে দৃষ্টি কেড়ে নিল রানার। চকচকে গোল একটা মাথা লোকটার, কামানো। অবাক একটা ভাব ফুটে রয়েছে মুখের চেহারায়, মুখটা হাঁ করা। রানার মনে হলো, এই ভঙ্গিটা চর্চা করে অর্জন করেছে সে। ছটফটে স্বভাব, দ্রুত এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে মস্ত মাথাটা, যেন খুঁজছে কাউকে। চোখ দুটোর মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আছে একটু বাইরে, দূর থেকে দেখে মনে হলো। বার থেকে প্রচুর মদ গিলে এসেছে, টলতে টলতে এদিকেই আসছে দু'জন।

নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে ছিল রানা, হাতের ওপর একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। রেবেকাও চেয়ে আছে দাতাকুর দিকে, নিজের অজান্তেই একটা হাত চেপে ধরেছে সে রানার।

রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দাতাকু। সাদা হ্যাটটা কপালের ওপর তুলে দিল। রোমহীন চোখের ওপরটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। হনুমানের মত লাগছে দেখতে। ঠোঁট মুড়ে হাসল সে। গ্লাসটা মুখের সামনে তুলে রেবেকার দিকে তাকাল, তারপর চুমুক দিল দু'বার পরপর, দ্রুত। টলতে টলতে আরও এগিয়ে এল সে।

'গুড ইভনিং!' রানা আর রেবেকার দু'পাশের ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল দাতাকু, 'আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, রানা।'

কেউ যখন কোন জবাব দিল না, দাতাকু হাতের গ্লাসটা তুলে ধরে বলল, 'রানা, আমি চাই, তোমাদের পুনর্মিলন উপলক্ষে গলা ভিজিয়ে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করতে। মিস রেবেকা, আপনাদের পুনর্মিলন দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই কামনা করি। যদি কিছু মনে না করেন, আমার সাথে নাচবেন কি?'

উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে মুখের কাছে গ্লাস তুলে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিল দাতাকু, হাঁ করা মুখের ভিতর গ্লাসের তরল পদার্থ কলের পানির মত পড়তে লাগল। দেখাদেখি একই ভঙ্গিতে গলায় হুইস্কি ঢালল সঙ্গী লোকটা।

'এ আমার বন্ধু কারাচ,' বলল দাতাকু, 'ওর ধারণা আমার সঙ্গে নাচের প্রস্তাব পেলে যে-কোন মেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠবে। আপনার কি মনে হয়, মিস রেবেকা? ওহ হো, ভুলেই গেছি, আপনি তো প্রস্তাব পেয়ে আতঙ্কিত হননি। লেটস গো,' হাত বাড়িয়ে দিল দাতাকু।

ঝট করে শরীরটা আপনা থেকেই চেয়ারের একধারে সরে গেল রেবেকার, স্পর্শের ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।

'হাত সরাও,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। টেবিলের একটা গ্লাস ধরে আছে ও, চাপ যেভাবে বাড়ছে, যে-কোন মুহূর্তে সেটা ভেঙে যেতে পারে।

দ্রুত হাতটা সরিয়ে নিয়ে দাতাকু বলল, 'দুঃখিত, ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি আমি, রানা। পুনর্মিলনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে এসেছ, মনে হচ্ছে।'

কি বলছে না বলছে ভেবে দেখার আগেই রেবেকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি।'

'খুব তাড়াতাড়ি...,' মাতালের মত বিড়বিড় করল দাতাকু। দশ সেকেন্ড চেয়ে রইল সে রেবেকার দিকে লাল চোখ মেলে, 'খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি, স্বীকার করি। জীবনের ঠিক-ঠিকানা নেই, কে কতদিন বাঁচে কে জানে, তাই না? আজ আছি, কাল হয়তো থাকব না, সুতরাং শুভ কাজগুলো সেরে ফেলাই ভাল—ঠিক।'

স্থির চোখে চেয়ে আছে রানা। গ্লাস ধরা হাতটা এক চুল নড়ল না কথা বলার সময়। শোরগোলের মধ্যেও ওর মৃদু কণ্ঠ পরিষ্কার শোনা গেল। 'বন্ধুদের সঙ্গে একটা উৎসবে আছি আমরা, দাতাকু। তুমি যাও।'

কেঁপে কেঁপে হাসল দাতাকু। 'ভয় পেলে নাকি? তাহলে চলেই যাই। কিন্তু হম্বিতম্বি করে মিস রেবেকাকে হয়তো মুগ্ধ করতে পারবে, আমাকে নড়াতে পারবে না।'

খুব সহজ ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল রানা।

শ'দুই লোক কথা বলছে, হাসছে। চামচ, প্লেট আর গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ চারদিকে।

হাতের গ্লাসটা বুকের কাছে ধরা রানার। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আশপাশের দু'একটা টেবিলের লোকজন থমকে গিয়ে চেয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে।

'আর একটাও কথা নয়, দাতাকু,' বলল রানা।

দ্রুত বাড়ছে দর্শকের সংখ্যা। সাত-আটটা টেবিল পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সবাই ঘন ঘন তাকাচ্ছে, একবার দাতাকুর দিকে, আরেকবার রানার দিকে।

কায়ানকে দেখে বোঝার উপায় নেই কিছু। পিঠ-টান করে বসে আছে সে চেয়ারে। একটা হাত কোটের বটন হোলের কাছে নিশপিশ করছে, ভিতরের পকেটে পিস্তল আছে তার। পায়রার মুখের হাসি আগের মতই, এতটুকু ম্লান হয়নি। রেবেকার দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে সে। তার সহাস্য কথা কানেই ঢুকছে না রেবেকার, ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে সে রানার দিকে।

দাতাকুর চকচকে তামাটে মুখের সর্বত্র বিন্দু বিন্দু ঘাম। একজন ওয়েটার ড্রিঙ্ক ভর্তি গ্লাসসহ ট্রে নিয়ে পিছিয়ে গেল, তার রাস্তাটা রানা আর দাতাকুর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দেখতে পেয়ে।

'তোমাকে রুখে দাঁড়াতে দেখে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার,' বলল

দাতাকু, ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা জমবে তাহলে এবার। সবাই জানে, শত্রু যদি নির্জীব হয়, তাকে আঘাত করে মজা পাওয়া যায় না। তা, বাইরে কি তুমি যেতে রাজি হবে এই মুহূর্তে, রানা?’

আশপাশে এখন আর কোন শব্দই নেই। বাঁ হাতটা কেউ ধরে ফেলল, সম্ভবত রেবেকা। ডান হাতের গ্লাসটা শূন্যে ছেড়ে দিল ও। গ্লাসটা পড়ে যাচ্ছে. দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে চমকে উঠল দাতাকু। রানার ঘুসি পাকানো হাতটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল সে। ডান হাত তুলতে যাবে তার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল মুখের ওপর।

ঘুসিটার ব্যথা নয়, জোর অনুভব করে বিস্মিত বোধ করল দাতাকু। পাঁচ গজ দূরত্ব পেরিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল সে, দুটো টেবিল আর একজন ওয়েটারকে উল্টে দিয়ে। ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে ওকে উঠে বসতে সাহায্য করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেল একজন। কারাচ ওকে ধরে দাঁড় করাল, তাকে বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের মুখোমুখি হলো সে। অদ্ভুত বিনয়ের সঙ্গে হাসল। ‘সব দোষ আমার, ম্যানেজার সাহেব। আমার বন্ধু মি. রানা নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছেন, ওর সঙ্গে কৌতুক করতে যাওয়াটা ভুল হয়ে গেছে আমার। ও যদি ক্ষমা চায়, আমি কৃতার্থ হব, আর যদি ক্ষমা না চায়,…’ শ্রাগ করল সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। ম্যানেজার কথা বলতে যাচ্ছে দেখে স্মিত হেসে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে, কারাচের কাঁধ ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

প্ল্যানটা রেবেকার: বারোটা এক মিনিটে বিয়ে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, মাত্র দু'জনের উপস্থিতিই যথেষ্ট, বর এবং কনে। সাক্ষী? উকিল? ম্যারেজ রেজিস্ট্রার? পায়রার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই রেবেকা নিজেকে এবং রানাকে দেখিয়েছে চোখের ইশারায়, তারপর বলেছে, ‘আমরাই সব।’

শহরের অভিজাত এলাকা কোপরা বারু রোডের দোতলা বাড়িটা ক'দিনের জন্যে ধার দেয়ার প্রস্তাব দিল পায়রা. সাড়ে দশটায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। টেলিফোনে পায়রা যখন ফুলের অর্ডার দিচ্ছে তখন বাজে পৌনে এগারোটা, কায়ানের কাছ থেকে বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে রেবেকাকে নিয়ে মার্কেটিঙে বেরুল রানা।

পথে ট্যাক্সি থামিয়ে পূর্ব পরিচিত ভি.আই.পি স্টোরে ঢুকল ও। ম্যানেজার কুয়ান লী, রানাকে দেখেই বেরিয়ে এল কাঁচঘেরা কেবিন থেকে। ‘অনেকদিন পর আবার এলেন, স্যার। সব ভাল তো? আপনার প্রিয়…’

‘না, কুয়ান, টাই কিনতে আসিনি,’ বলল রানা, ‘বিশেষ একটা সেন্ট খুঁজছি আমি। টয়োমেন।’

‘টয়োমেন?’ কুয়ানের ভুরু কুঁচকে উঠল, ‘জাপানী সেন্ট, কিন্তু সিঙ্গাপুরে

কেউ ব্যবহার করে বলে তো মনে হয় না। স্যার, আপনি দ্রন ফুঙের কাছে খোঁজ করে দেখতে পারেন, ঠিকানাটা দিচ্ছি। জাপানী জিনিসপত্রের ইমপোর্টার ও, ওর কাছে থাকলেও থাকতে পারে।'

মার্কেটের ভিতরই দ্রনের অফিস। কুয়ান লীর নাম শুনেই সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে। রানার প্রশ্ন শুনে টোব্যাকো পাইপের গোড়া কপালে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'কি দুঃখের ব্যাপার ভাবুন একবার! গত ছয় মাস ধরে অর্ডার দেয়ায় মাত্র একডজন টয়োমেন আনিয়েছিলাম, গত কালই পাঠিয়ে দিলাম...'

'কার কাছে? কে অর্ডার দিয়েছিল?' উত্তেজনা চেপে রেখে জানতে চাইল রানা।

'বালির একজন ডীলার।'

'বালি?' রানা বলল, 'দু'একদিনের মধ্যেই বেড়াতে যাচ্ছি বালিতে। ডীলারের ঠিকানাটা যদি দিতে পারেন...'

'বুঝেছি! কেউ শখ করেছে, তাই না?' সবজান্তার মত হাসল দ্রন, 'কিম হো হোয়াৎ, ডেন পাসার, এই হলো ঠিকানা। পার্সেলটা পৌঁছুতে দু'চার দিন দেরি আছে এখনও।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রানা। হীরের আঙটি, মুক্তো বসানো হার ইত্যাদি কিনতে কিনতে রেবেকা যখন মনে করিয়ে দিল বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেছে, তখন ফেরার জন্যে ট্যাক্সিতে চড়ল ওরা। পায়রাকে নিয়ে কায়ান তখন চলে গেছে। গোটা বাড়িটা ফুলের বিছানা দিয়ে মোড়া দেখল ওরা। জানালায়, দরজায় ফুলের ঝালর। টেবিলে গোলাপের স্তবক। সুগন্ধে দম আটকাবার যোগাড়।

সদ্য কর্ক খোলা জনি ওয়াকারের বোতল সামনে নিয়ে নিচের সিটিংরুমে মিনিট দশেক কাটাল ওরা। সকাল বেলার ফ্লাইটে জাকার্তা ছুঁয়ে ডেন পাসারে যাবে, সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল রেবেকাকে দোতলায় রানা। পায়রার বেডরুমের সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'বিশটা মিনিট সময় দেবে?' ছোট্ট করে মাথা নেড়ে অনুমতি দিল রেবেকা, চোখে চোখ রেখে হাসল। করিডর পেরিয়ে গেস্টরুমে ঢুকল রানা, সেখান থেকে সংলগ্ন বাথরুমে। শাওয়ার খুলে দিয়ে নিচে দাঁড়াল ও।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে গেল রানা। সিল্কের গাঢ় সবুজ ড্রেসিং-গাউন পরে বসল একটা ইজি-চেয়ারে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে বাগান থেকে। ফুলের গন্ধে নেশা ধরে যায়। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে রেডিওর শব্দ, আশপাশের কোন বাড়িতে ঘুম নেই একজনের চোখে। অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করছে রানা। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো এমন মধুরও যে হয়, জানা ছিল না ওর।

রেবেকার দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাচ্ছে ও। গর্ব অনুভব করল নিজের মধ্যে রানা। রেবেকার ভাল-মন্দের ভার সব এখন ওর উপর। গত ক'সপ্তাহ ধরে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথাই শুধু ভেবেছে ও, কিন্তু আজ থেকে পরিস্থিতির রদবদল ঘটতে যাচ্ছে। শুধু নিজেকে নয়, রেবেকাকেও রক্ষা করার দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে।

রেডিওতে চড়া ভল্যুমে জাপানী পল্লী সঙ্গীত বাজছে।

রিস্টওয়াচ দেখে হেলান দিল রানা ইজি-চেয়ারে। এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। কান পাতল ও। কিসের শব্দ? টেলিফোনের?

হয়তো। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না রানা।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপন মনে হাসল ও। ডেন পাসার হয়ে বালিতে যাবে ওরা। দশদিন থাকবে ওখানে। হানিমুন শেষ করে ফিরবে কিংস্টনের খামার-বাড়িতে। ওখানেই ওদের ভবিষ্যতের শুরু। রেবেকা, খামার-বাড়ি, রকি...

চিন চিন করে উঠল বুকটা। মনেই ছিল না রকি নেই। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল মুখের হাসিটা।

দাতাকু। কালো অশুভ একটা ছায়া যেন। রানা হঠাৎ অনুভব করল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত লয়ে চলছে ওর।

অবস্থা সেই আগের মতই, এখনও জানে না রানা কিভাবে ক্ষান্ত করবে সে দাতাকুকে। পার্থক্য শুধু এইটুকু, আগের চেয়ে দায়িত্ব বেশি অনুভব করছে কাঁধে, সেই সঙ্গে নতুন আত্মবিশ্বাস! রেবেকার ভালবাসা, এটাই কারণ।

আটলান্টিকের হিমশীতল পানি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল রেবেকা, দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। তারপর হিমবাহের ওপর কপ্টার নামাবার পর রেবেকার সেই আতঙ্ক, কখনও ভুলবে না ও। ভুলবে না রানাকে বাঁচাবার জন্যে স্যার ফ্রেডারিকের গুলি খেয়ে মরতে চাওয়ার সেই দৃঢ় মনোবলের কথা।

কেউ নেই রেবেকার, কথাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল রানার। ও ছাড়া কেউ নেই ওর।

আরও তিন মিনিট।

অধীর উত্তেজনা, সেইসাথে মাদকতাময় রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করল আবার। সেই একুশ বছরের জীবনে যেন ফিরে গেছে সে, এবং জীবনে এই প্রথম যেন এ ধরনের রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। রিস্টওয়াচ থেকে চোখ তুলল না ও: আর মাত্র এক মিনিট বাকি।

সেকেন্ডের কাঁটা প্রথম অর্ধেক পথ পেরুতে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ষাটের ঘরের দিকে সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটা। ফুলের ঘ্রাণভরা একবুক বাতাস ফুসফুসে টেনে নিয়ে পা বাড়াল ও। কামরা

থেকে বেরিয়ে করিডর পেরোল, দাঁড়াল রেবেকার কামরার সামনে। ভিতর থেকে উপচে উঠছে আনন্দের ধারা, সুখের হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

নক করল ও।

সাড়া নেই। হাতল ধরে ঘোরাল। কবাট ফাঁক করল এক ইঞ্চি মৃদু গলায় ডাকল, 'রেবেকা, আসতে পারি?'

সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকল রানা। জোড়া বিছানার ডান দিকের একটা টেবিল ল্যাম্প থেকে আলো আসছে, বাকি সব আলো নেভানো। বাথরুমের দরজা খানিকটা ফাঁক করা, এগিয়ে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। নেই। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দৃষ্টি আটকে গেল। স্যান্ডেল জোড়া পাশাপাশি পড়ে আছে। তিন সেকেন্ড একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন একটা সঙ্কেত পড়তে চেষ্টা করল রানা।

শূন্য বিছানার ওপর পড়ে আছে হেয়ারব্রাশটা। রেবেকার হাতঘড়িটা দেখতে পেল রানা টেলিফোনের পাশে। রেবেকার নাইটড্রেস বা ড্রেসিং-গাউনের কোন চিহ্নই নেই কোথাও।

'রেবেকা!'

বাড়ির সবখান থেকে চিৎকারটা শোনার কথা। কিন্তু সাড়া নেই তবু। একবার মনে হলো, ওর দেরি হবে ভেবে নিচের সিটিংরুমে বা বাগানে সময় কাটাতে যেতে পারে রেবেকা।

সিটিংরুমটা অন্ধকার। আলো জ্বালল রানা। তারপর চাঁদের আলোয় গিয়ে দাঁড়াল। বাগানেও নেই রেবেকা।

কোথাও নেই!

তীক্ষ্ণ চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা পাখি।

একটা শব্দ হয়েছে মিনিট পাঁচেক আগে। রানা দ্রুত ভাবছে। কিসের শব্দ ছিল সেটা? কলিংবেলের? টেলিফোনের?

কেঁপে উঠল রানার বুক।

সাত

টেলিফোনের শব্দ। হেয়ারব্রাশ ধরা হাতটা মাথার চুলের ওপর স্থির হয়ে গেল রেবেকার। বিয়ের এই রাতে কে আবার···পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল, এটা পায়রা কায়ানদের বাড়ি, ওদের জানাশোনা কেউ হয়তো ফোন করছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এল সে বেডসাইড টেবিলের কাছে,

ব্রাশটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল রিসিভার।

প্রশ্ন হলো, 'মিস রেবেকা? মানে, বলতে চাইছি, অদূর ভবিষ্যতের মিসেস রানা?'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারল না রেবেকা। প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পেরেছে লোকটা কে।

'কি চান?' ঢোক গিলে জানতে চাইল রেবেকা।

'নড়বেন না একচুল, বা চিৎকার করার চেষ্টা করবেন না,' দৃঢ় গলায় নির্দেশ দিল দাতাকু, 'আপনাকে এবং রানাকে, আপনাদের দু'জনকেই আমি দেখতে পাচ্ছি টেলিস্কোপের সাহায্যে। বলা বাহুল্য, টেলিস্কোপটা ফিট করা রয়েছে আমার অটোমেটিক রাইফেলের সঙ্গে। এই মুহূর্তে টেলিস্কোপ দিয়ে রানাকে দেখছি আমি, অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে সে গেস্টরুমের একটা ইজি-চেয়ারে বসে। আপনি নিশ্চয়ই চান না ওর বুকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিই ট্রিগারে চাপ দিয়ে? যদি চান তাহলে চিৎকার করে ওকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করুন।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘাড় ফেরাল রেবেকা খোলা জানালাটার দিকে। বাগান, প্রাচীর, প্রাচীরের বাইরে সরু রাস্তা, তারপর দুটো পাশাপাশি বাড়ি, অন্ধকারে ঢাকা। ওই দুটো বাড়ির যেকোন একটার জানালার সামনে বসে আছে দাতাকু, অনুমান করল সে। 'মি. দাতাকু, আপনি কি ধরনের মানুষ···'

'মানুষ আমি ভাল নই,' বলল দাতাকু, 'এতদিনে তা বুঝে নেয়া উচিত ছিল আপনার। সে যাক, এখন আপনাদের আমি মুঠোর ভেতর পেয়েছি, যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন। তা না হলে···বুঝতেই পারছেন।'

গলার কাছে ড্রেসিং-গাউনের কলার মুঠো করে ধরে আছে রেবেকা, ঘাড় ফেরাল পাশের জানালার দিকে। অন্ধকার বাড়ি দুটোর দিকে চেয়ে আছে ও।

'আমার কথা শেষ হলে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন,' বলল দাতাকু, 'তারপর সাবধানে বেরিয়ে যাবেন করিডরে; দেখবেন পায়ের কোন শব্দ যেন না হয়। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বাগানের গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন। দশ গজ হেঁটে বাঁক নিলেই দেখতে পাবেন গাড়িটা। আপনি উঠলেই গাড়ি ছুটতে শুরু করবে। কোন ভয় নেই, আপনার কোন ক্ষতি আমরা করতে যাচ্ছি না। কিছু আলোচনা আছে আপনার সাথে, তাই এই ব্যবস্থা। গাড়ি আপনাকে নিয়ে রওনা হলে আমি রাইফেল সরাব রানার পিঠের দিক থেকে, তার আগে নয়। বুঝতেই পারছেন, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে যদি পালন করেন, রানার কোন বিপদই ঘটবে না। কিন্তু আপনি যদি অবাধ্যতা দেখান, ওকে যদি কোন ভাবে কিছু জানাবার চেষ্টা করেন, তাহলে শুধু আপনার বোকামির জন্যেই ওকে মরতে হবে।'

রেবেকা ভাবছে দ্রুত।

'আমার কথা কানে ঢুকছে?' তীব্র গলায় জানতে চাইল দাতাকু।

'কিন্তু আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি,' চাপা কণ্ঠে বলল রেবেকা, 'ওকে আপনি খুন করতে চান না। আমাকে ভয় দেখানোই আপনার উদ্দেশ্য...'

'ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে? ভুল কি নির্ভুল তা যাচাই করতে চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে আপনাকে। রানার প্রাণের ওপর ঝুঁকি–নেবেন আপনি?'

কি করা উচিত বুঝতে পারছে না রেবেকা। মাত্র দশ গজ দূরে রয়েছে রানা। একটা চিৎকার, মাত্র দু'সেকেন্ডের ব্যাপার। চেয়ার ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসবে ও। চিৎকার করার সঙ্গেই যদি সে টেবিল ল্যাম্পটা অফ করে দেয়, কি ঘটতে পারে? রানা চেয়ার ছেড়ে উঠতে শুরু করবে, সেই সঙ্গে ড্রইংরুমের আলো নিভে যাবে। অন্ধকারে তাকে গুলি করতে পারবে না দাতাকু। কিন্তু রানাকে? গুলি করার সিদ্ধান্ত নিতে ক'সেকেন্ড সময় নেবে দাতাকু? পাঁচ সেকেন্ড? না, পাঁচ সেকেন্ড লাগবে না তার। হয়তো দেড় কি দু'সেকেন্ড, বড় জোর। এই দু'সেকেন্ডে চেয়ার থেকে কতটা দূরে সরতে পারবে রানা? সরলেও, দাতাকুর দৃষ্টিপথের আড়ালে পৌঁছুতে পারবে ও?

হাতের তালু ভিজে গেছে ঘামে।

'দেখুন,' অস্বাভাবিক শান্ত লাগল রেবেকার কানে দাতাকুর কণ্ঠস্বর, 'ধ্বংস ডেকে আনতে পারে এমন কিছু ভাববেন না, এটাই আমার অনুরোধ। স্বীকার করছি, আপনি ঠিকই ধরেছেন, রানাকে আমি খুন করতে চাইছি না। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, এই ধরনের একটা রাইফেল ব্যবহার করার আগের মুহূর্তে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় আঘাতটা কি রকম হবে! আমার হাতে এটা অটোমেটিক রাইফেল, প্রতিটি বুলেটকে আমি নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করব, তা আশা করতে পারি না। তাই, কি হয়, কিছুই বলা যায় না। গোণা শেষ হওয়ার পরও যদি দেখি আপনি বাড়ির বাইরে বেরুতে চাইছেন না, গুলি আমাকে করতেই হবে। ঠাট্টা যে করছি না, তখন প্রমাণ পাবেন, কথা দিচ্ছি। নিন, আমার সাথে সাথে আপনিও গুনতে থাকুন। এই...দুই...'

টেবিলে খুলে রাখা রিস্টওয়াচটার দিকে তাকাল রেবেকা। বিশ মিনিট সময় চেয়েছিল রানা, কিন্তু তখন ক'টা বেজেছিল দেখেনি সে। বিশ মিনিট কি পেরোয়নি এখনও? নাকি, দশ মিনিট মাত্র পেরিয়েছে?

ভয়ে শুকিয়ে আসছে গলা, কিন্তু ভয়ের চেয়ে বেশি রাগ লাগছে তার। কিছু একটা এই মুহূর্তে করা দরকার।

'তিন...চার...'

রানাকে কাছে পাওয়ার একটা ইচ্ছা হঠাৎ গ্রাস করল রেবেকাকে, নাম ধরে ডাকার জন্যে মুখ খুলল সে, কিন্তু সেই মুহূর্তে কানে 'পাঁচ'-এর আকারটা প্রলম্বিত লয়ে বাজতে শুরু করায় মুখ বুজে ফেলল আবার।

'ছয়…'

কিন্তু কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না এখনও রেবেকা। হয় রানা না হয় আমি! কোন বিকল্প? না, নেই।

'সাত…।' দাতাকু বলল, 'বেশি সময় নেই আর, মিস রেবেকা।'

চোখ বুজে ভাবতে চাইছে রেবেকা। হঠাৎ সে অনুভব করল, তার মাথা কাজ করছে না। শীত করছে তার। জানালার দিকে দৃষ্টি ফেলতে একটা জোনাকিকে শুধু জ্বলতে নিভতে দেখল সে।

দম বন্ধ করে দাতাকুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে তৈরি হচ্ছে রেবেকা আবার।

'এই শেষবার বলছি, মিস রেবেকা, ঠাট্টা করছি না আমি। আট…'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রেবেকা। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে যেন সে, টলমল করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াবার আগে ফুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা বেডরুমের সৌন্দর্যটুকু দেখে নিল একবার চোখ বুলিয়ে। দরজা খুলে করিডরে বেরুল সে। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। মাত্র সাত গজ দূরে গেস্টরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিন সেকেন্ড। মাথা ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সিঁড়ির দিকে। তারপর পা বাড়াল।

নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দশগজ হাঁটল সে, বাঁক নিতেই দেখতে পেল কালো গাড়িটাকে। মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল, ছুটে পালাবে নাকি অন্য কোন দিকে? দাতাকুর রাইফেল এখনও তাক করা আছে রানার পিঠের দিকে ভেবে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। খুঁত খুঁত করছে মনটা। ভুল করছে না তো সে? সত্যিই কি রাইফেল তাক করে ধরে আছে দাতাকু?

গাড়ির দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল। স্টার্ট নিল গাড়ি।

সামনে স্টিয়ারিং নিয়ে বসে আছে লোকটা। কারাচ। চাঁদের আলোয় কোটর ছেড়ে অর্ধেক বেরিয়ে থাকা চোখের মণি জোড়া চকচক করছে। ইতস্তত করল রেবেকা, তারপর মরিয়া একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে গাড়িতে উঠে কারাচের পাশে বসল।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

দু'জনেই চেয়ে আছে সামনের দিকে। যথাসম্ভব এক ধারে সেঁটে বসেছে রেবেকা। দু'বার মোড় নিয়ে শ'খানেক গজ দূরত্ব পেরোল গাড়ি, তারপর একটা গলিমুখের সামনে থামল। মিনিট দুয়েক পর অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা কালো ছায়া। দাতাকু।

গাড়ির পেছনে সীটে উঠে বসল সে। সরাসরি তার দিকে তাকাল না রেবেকা। কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে তার হাতে পিস্তল রয়েছে দেখতে পেল

সে।

অরেঞ্জ গ্রোভ রোডে পড়ল গাড়ি। স্পীড তখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল।

নিজের বিপদের কথা এতক্ষণে ভাবছে রেবেকা। রানা এখন বিপদমুক্ত, বুকটা হালকা হয়ে গেছে তার। মাথা এখন পরিষ্কার, আবার চিন্তা করতে পারছে। কারাচের দিকে ফিরল সে, জানতে চাইল, 'আপনি কে? আপনি কেন…'

'ধৈর্য ধরুন,' বলল কারাচ, সামনের দিকে চোখ রেখে। 'জানতে পারবেন।'

বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসতে দেখলে সাহায্য চাইবার জন্যে কোনরকম চেষ্টা করবে না সে, ভাবল রেবেকা। কিন্তু পেছন থেকে যদি কোন গাড়ি ওদের ওভারটেক করছে দেখতে পায়, সুযোগটা নেবে। স্পীডোমিটারের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হলো সে। ষাটের ঘরে কাঁপছে মিটারের কাঁটা। তাছাড়া, সময়টা এখন মধ্য রাত। নির্জন হাইওয়েতে গাড়ি দেখতে পাওয়ার আশা নিতান্তই কম।

রাস্তার ডান দিকে খাদ শুরু হলো। বাঁ দিকে পাহাড়ের খাড়া গা অনেক আগে থেকেই লক্ষ করছে রেবেকা। হঠাৎ শিউরে উঠল সে পেছন থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে চকচকে সোনালী সিগারেট কেসটা মুখের সামনে এসে থামতে। দরজার দিকে আরও সরে গেল সে, সরিয়ে নিল মাথাটা। হাতটা ফিরিয়ে নিল দাতাকু। কাঠ হয়ে বসে আছে রেবেকা, ক'সেকেন্ড পর লাইটার জ্বলে ওঠার শব্দ পেল পিছন থেকে। ঘন ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী রেবেকার চুল আর কান ছুঁয়ে মন্থর গতিতে মুখের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' রেবেকার সীটের দিকে ঝুঁকে পড়ে পেছন থেকে বলল দাতাকু, 'আপনার জীবনের এমন একটা মধুর রাত, সম্ভব হলে এই রাতের মাধুর্যটুকু এমন বেরসিকের মত নষ্ট হতে দিতাম না আমি, বিশ্বাস করুন। আপনার সাথে আমার কোন রেষারেষি নেই। রানার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, এটাই আপনার একমাত্র দুর্ভাগ্য। আগেই আপনাকে জানিয়েছিলাম, ওই লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে আপনার কোন বিপদ ঘটবে না।'

ঢোক গিলল রেবেকা। কি যেন বলতে চাইছে দাতাকু, কিন্তু তারিয়ে বলার মজাটুকু উপভোগ করতে চাইছে সেই সঙ্গে, মনে হলো তার।

'খানিক আগে যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি আমার বন্ধুকে,' দাতাকু বলল সহজ গলায়, 'সে প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা আছে, অথবা একটু চেষ্টা করলে আপনি কল্পনা করে নিতে পারবেন, আমার বিশ্বাস। আপনি তো জানেন, রানাকে আমি খোঁচাতে চাই। যেখানে খোঁচা দিলে ওর ব্যথা লাগবে ঠিক সেইখানে…এবার বুঝে নিন।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কারাচ জানে,' মৃদু শব্দে হাসল দাতাকু। 'যে জায়গা ওর পছন্দ হবে সেখানেই থামাবে গাড়ি। কাজ সেরে রাত শেষ হবার আগেই অবশ্য ফিরব আমরা শহরে। আপনাকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে রানার কাছে, কিন্তু সে আপনাকে গ্রহণ করবে কিনা...'

কারাচের কুৎসিত হাসিটা অশ্লীল, গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল রেবেকার।

'আমার সুপরামর্শগুলো যদি গ্রহণ করতেন,' দাতাকু বলল, 'এসব কিছুই ঘটত না। কথা শোনেননি তার জন্যে আপনার এই শাস্তি। ওর হাতে তুলে দিয়েছি, কারণ আপনাকে নাকি দারুণ পছন্দ হয়েছে ওর। কারাচ এখন কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে আপনার কাছ থেকে ওর মজুরি। রানা...'

তৈরি ছিল না তাই অপ্রত্যাশিত আক্রমণটা মুহূর্তের মধ্যে তছনছ করে দিল ওদের অনুকূল পরিস্থিতিটাকে। হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবেকা কারাচের ওপর। দু'হাত দিয়ে ধরে টান মারতেই স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত দুটো ছুটে গেল তার। গা ঝাড়া দিয়ে রেবেকাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে সে দেখল গাড়িটা তির্যক ভাবে ছুটে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের দিকে।

ছিটকে পড়ল রেবেকা ধাক্কা খেয়ে সীটের অপরপ্রান্তে।

'ধরো ওকে, সামলাও!' চিৎকার করে উঠল কারাচ দাতাকুর উদ্দেশে।

ঘাড়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা অনুভব করল রেবেকা। সুইচ অন করার মত প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল পরমুহূর্তে। আগুনের স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রেবেকার শরীরে। দু'হাত তুলে দশটা আঙুল বাঁকা করল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কারাচের মুখের ওপর।

বাঁ হাতের তর্জনী সেঁধিয়ে গেল কারাচের চোখের মণির পাশ ঘেঁষে ভিতরে, উত্তাপ অনুভব করল রেবেকা আঙুলটায়। বিকট আর্তনাদ করে উঠে শরীরটা এলিয়ে দিল কারাচ। হ্যাঁচকা টানে বাঁ হাতটা সরিয়ে নিল রেবেকা। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দৃষ্টি পড়ল বাইরে, পাথর হয়ে গেল সে। দাতাকুর একটা লম্বা হাত কারাচের সীটের ওপর দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরার চেষ্টা করছে। কনুই দিয়ে হাতটাকে লক্ষ্যচ্যুত করে দিল রেবেকা, ততক্ষণে অপর হাত দিয়ে খুলে ফেলেছে সে দরজাটা।

গাড়ি নামছে খাদে। রাস্তার দিকের দরজাটা খোলা, কিন্তু তখনও সেটা গলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি রেবেকা। খানিক নিচেই একটা বড় পাথর, তাতে লেগে উল্টে গেল গাড়িটা, ডিগবাজি খেতে খেতে খাদের নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

আট

'জায়গা ছেড়ে নোড়ো না,' ওরা বলল রানাকে, 'রেবেকা, দাতাকু–দুজনেই জানে তোমার এই ঠিকানা। তুমি এখানে না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারাতে পারো। ফোনের পাশে বসে থাকো। যা কিছু করার আমরা করছি সব।'

সব প্রতিবাদ আর আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় মেনে নিল রানা ওদের কথা। জোহর কায়ান মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সাহায্য কামনা করল ইউনুসের, রানার অজান্তেই। জানতে পারলে রানা অনুমতি দেবে না, এ ভয় তার ছিল। রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না, এটুকু অন্তত জানে সে।

অফিশিয়ালি পুলিস বা সি.আই.ডি-কে জানাতে রাজি হলো না ব্যাপারটা ইউনুস। থানা হেডকোয়ার্টারে গেল সে জোহর কায়ানকে নিয়ে রাত এগারোটার দিকে, পুলিস চীফকে বলল, থাইল্যান্ডের একজন জেল ভাঙা আসামী সিঙ্গাপুরে অনুপ্রবেশ করেছে, তারা কি কিছু জানে এ সম্পর্কে?

আধ ঘণ্টা পর ওরা থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুল। প্রায় সব থানা স্টেশনে দাতাকুর চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।

দু'চোখ ভরা সহানুভূতি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে পায়রা, সান্ত্বনার নরম দুটো হাত রানার মুখটা ধরে আছে, কখনও পরম স্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর। 'রানা,' টেবিল থেকে কালো কফি ভর্তি থার্মোসটা তুলে নিয়ে বলল পায়রা। 'এই বিপদের সময় ভেঙে পড়লে চলবে কেন তোমার? নাও, ধরো।'

বিড় বিড় করে কি বলল রানা ঠিক বোঝা গেল না, সম্ভবত ধন্যবাদ জানাল পায়রাকে। তার হাত থেকে কফির কাপটা নিল।

'নিচে রাম আছে, নিয়ে আসি এক ছুটে?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করল রানা। যেদিকে তাকাচ্ছে ও, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আটকে থাকছে দীর্ঘক্ষণ, নিষ্পলক। কিছুই ভাবতে পারছে না। ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা, গোটা শরীর মন রী রী করছে ওর। দাতাকুর মত আর কোন মানুষকে এতটা ঘৃণা করেনি ও কখনও।

আর ভয়। রেবেকার জন্যে দম আটকানো ভয়। ঠাণ্ডা লাগছে ওর, ভয়ানক দুর্বল হয়ে উঠেছে হাত আর পা দুটো–ভয়ে। এ সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

'দাতাকু জানে রেবেকা তোমার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি,' হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল পায়রা বিছানার ওপর রানাকে, দু'হাত রাখল কাঁধে, তারপর ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল ওকে। বালিশটা নেড়ে ঠিক করে

দিল, মাথাটা ধরে বালিশের মাঝখানে সরিয়ে দিল সে। তারপর ঝুঁকে পড়ল রানার মুখের ওপর। একটা হাত রানার মাথায়, আরেকটা রানার বুকে, আড়াআড়ি ভাবে। 'রেবেকাকে খুন সেজন্যেই করবে না সে। করতে পারে না। রেবেকা যদি না থাকে, তোমাকে আতঙ্কিত করার একটা উপায় হারাতে হবে দাতাকুকে। তা তো সে চায় না, তাই না? তোমাকে ভয় পাওয়ানোতেই তার আনন্দ। তোমাকে অস্থির করে তোলার মধ্যেই তার প্রতিশোধ। সুতরাং বোকা তো সে নয় যে রেবেকাকে খুন করবে!'

ধীরে ধীরে চোখ বুজল রানা। সিধে হয়ে বসল পায়রা, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার তুলে নিল। একটা সিগারেট ধরাল সে। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। চোখ মেলল রানা। পায়রার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। 'মন খারাপ করে থেকো না, প্লীজ!' শার্টের ভিতর হাত চালিয়ে দিয়ে রানার বুকে হাত রাখল সে, বলল, 'আমি বলছি, রেবেকার চরম কোন ক্ষতি করবে না দাতাকু।'

'রেবেকাকে যদি ফিরে পাই,' অস্ফুটে বলল রানা, 'দ্বিতীয়বার এ ঘটনা আর ঘটবে না।' উঠে বসল বিছানার ওপর ও।

চেয়ে রইল ওরা পরস্পরের দিকে ক'সেকেন্ড।

'ফোন ছেড়ে নোড়ো না,' বিছানা থেকে নামল রানা, 'শেভ আর শাওয়ারটা সেরে নিই।'

ভোর হয়ে এসেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে পায়রা। একটু পরই ফোন এল জোহর কায়ানের।

'শহর থেকে দূরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে,' কায়ান জানাল, 'রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদের নিচে পড়ে গেছে একটা গাড়ি। ভেতরে তিনজন আরোহী ছিল। দু'জন পুরুষ, বেঁচে নেই। চেনবারও উপায় নেই লাশ দুটোকে। কিছুই পোড়াতে বাকি রাখেনি আগুন। মেয়েটি খাদের গায়ে আটকে ছিল বলে বেঁচে গেছে, তবে জ্ঞান ফেরেনি এখনও।'

'কোত্থেকে কথা বলছ তুমি?'

'একটা সংবাদ সংস্থার অফিস থেকে,' বলল কায়ান, 'এই মুহূর্তে আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি হাসপাতালের দিকে। দুশ্চিন্তা কোরো না, রানা,' একটু থেমে আবার বলল কায়ান, 'আমার ধারণা, পাল্টা আঘাত তোমার না করলেও চলবে। সে তার নিজের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেই করে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক, পনেরো মিনিটের মধ্যে জানতে পারব সব।'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। একটি মুহূর্ত যেন একটি শতাব্দী, ফুরাতেই চায় না। পায়রাও অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। সত্যিই কি গাড়িটায় রেবেকা আর দাতাকু ছিল? অপর লোকটি কে? কারাচ?

ক্রিং! ক্রিং!

থমকে দাঁড়াল রানা। তারপর ঘুরল। রিসিভারটা পায়রার নাগালের মধ্যে। চেয়ে আছে সে রানার দিকে। হঠাৎ অভয় দিয়ে হাসল, 'কি হলো, রানা, রিসিভার তোলো! সুসংবাদটা তুমিই শোনো নিজের কানে, তারপর তোমার মুখ থেকে শুনব আমি।'

দ্বিতীয়বার বেল বাজছে। রানা দু'পা এগিয়ে তুলে নিল রিসিভার, 'হ্যালো!'

কায়ান নয়। শরীরে আনন্দের একটা স্রোত ধাক্কা মারল: রেবেকার গলা! 'রানা, রানা, আমি ভাল আছি! কিছুই হয়নি আমার, একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। আর···আর···' হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেবেকা। কথাটা বলতে পারল না সে।

পরমুহূর্তে কায়ানের গলা শুনল রানা, 'আমার ধারণাই ঠিক। গাড়িতে ওরাই ছিল। তোমার সমস্যার সমাধান ঘটে গেছে চিরতরে। কংগ্র্যাচুলেশনস! রেবেকাকে নিয়ে আসছি আমি।'

বলতে হলো না কিছু, রানার মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল পায়রা। রানা রিসিভার নামিয়ে রাখা শেষ করার আগেই সে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত রানার ওপর গিয়ে পড়ল। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে রানার কপালে একটা চুমো খেয়ে ফেলল। 'কারও মৃত্যু সংবাদে এমন আনন্দিত হইনি কখনও আমি!'

কিন্তু আমি কেন বিষণ্নবোধ করছি? ভাবছে রানা। দাতাকু নেই, কেমন যেন খারাপ লাগছে। লোকটার প্রতি ভুল করে অবিচার করেছিল সে···কথাটা বারবার করে মনে পড়ছে এই মুহূর্তে।

সিগারেট ধরিয়ে পায়রার সঙ্গে নিচে নামল রানা। সিটিংরূমে বসল ওরা। নিচে থেকে ফোন করছে পায়রা ওদের দ্বিতীয় বাড়িতে। কাশমাকে সুসংবাদটা জানাচ্ছে সে।

বিশ মিনিট পর গাড়ির শব্দ পেল ওরা।

বালি। ইন্দোনেশিয়ার স্বর্গীয় দ্বীপ।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিল ওরা।

'বলেছিলাম না, ডেন পাসার ঘিঞ্জি এলাকা?' বলল রানা, 'কিন্তু ডেন পাসারকে দেখে বালি সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ কোরো না। বালি হলো সৌন্দর্য পূজারীদের তীর্থস্থান, খানিক পরই তার প্রমাণ পাবে। এক মিনিট,' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল রানা, 'ওহে, চীনা মার্কেটের সামনে থামো একবার।'

ফোর্ডটাকে দাঁড় করাল ড্রাইভার মার্কেটের সামনে। রেবেকাকে বসিয়ে রেখে নেমে গেল রানা। ঠিকানা মিলিয়ে কিম হোর দোকানে ঢুকল। ওর প্রশ্নের উত্তরে কিম হো জানাল, 'সিঙ্গাপুর থেকে টয়োমেনের একটা চালান

আসার কথা আছে বটে, কিন্তু দুঃখিত, ওটা কায়ুদানার সুলতানের অর্ডারের মাল। না, এই সেন্ট এদিকে আর কেউ ব্যবহার করে বলে জানা নেই আমার।'

ডেন পাসারকে ছাড়িয়ে বালিতে পৌঁছুল ওরা। এর আগে তিনবার আসা হয়ে গেছে রানার, প্রায় প্রতিটি গ্রাম ওর চেনা। চীনা ড্রাইভারের পাশে বসা কাশমা নাকি সুরে চ্যাঙ-চুঙ চোঙ চা করছে, বোঝা গেল চীনা ভাষা মোটামুটি জানা আছে তার।

আর রেবেকা, সে মেয়েই যেন নয়! সেই বিষণ্ণতার ধূসর ছায়া সরে গেছে মুখের চেহারা থেকে। গাড়ির বাইরে আঙুল বের করে দিয়ে এটা কি ওটা কি জানতে চাইছে। হাসছে রানা, আর উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। রেবেকা যে কচি শিশুর মত এতটা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠতে পারে, জানা ছিল না ওর। রানার উত্তরের সবটুকু শোনার অপেক্ষাতেও থাকছে না সে, খিলখিল করে হেসে উঠছে, কখনও আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলছে।

স্বচ্ছ, হলুদ সূর্যালোকে চিকচিক করছে খাল আর নদীর পানি। ধানখেতে কৃষকেরা কাজ করছে। দূর পাহাড়ের মাথায় ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ, বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

দু'পাশে বালিনিজ গ্রাম। হিন্দু আর বৌদ্ধদের মন্দির প্রতি একশো গজের মধ্যে একটা না একটা চোখে পড়ছেই, অমনি ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠছে রেবেকা, 'থামাও, থামাও!'

'আর গ্রামগুলো যে এত সুন্দর তা তো বলোনি আমাকে?' বিস্ময় আর আনন্দের সাথে অভিযোগ করল সে।

'গিয়ানজারে থামব আমরা, রেবেকা,' বলল রানা, 'ওখানকার গ্রাম আর মন্দিরগুলো দেখতে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে ট্যুরিস্টরা আসে। এখন অবশ্য ট্যুরিস্টদের আসার সময় নয়, আমরা বেশ নিরিবিলিতে সময়টা কাটাতে পারব। বেদাবায় পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দেব, ওখান থেকে হাঁটা পথ। দর্শনীয় স্থান দেখতে হলে গাড়িতে বসে থাকলে চলবে না।'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, বালিকে নাকি হানিমুন আইল্যান্ড বলা হয়।'

'ঠিক,' বলল রানা, 'বালিনিজরা নব-দম্পতিদের বিশেষ চোখে দেখে। কোথাও যেতে বাধা নেই তাদের। প্রতিটি গ্রামে ব্রাইডাল চেম্বার আছে। বিদেশী হলেও নব-দম্পতিদের উপহার দেয়া বালিনিজদের একটা সামাজিক রীতি।'

'বালিনিজদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃষক হিসেবেও মনে করা হয়,' বলল রেবেকা, 'এখানে খানিক জায়গা না কিনলেই নয়, রানা।'

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গ্রাম, ভিতর দিয়ে চলে গেছে ইঁট বিছানো রাস্তা। গ্রামগুলোর আকারের কোন ঠিক ঠিকানা মিলবে না। কোন গ্রামে মাত্র একটি পুকুর, চার পাঁচটা কুঁড়ে ঘর, ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, দু'দশটা নারকেল বা সুপারি

গাছ—আর কিছু নেই। হয়তো একশো বর্গগজ তার আয়তন। আবার আট দশ মাইল জায়গা নিয়েও রয়েছে কোন কোন গ্রাম। গভীর বনভূমি, পাথরের পাহাড়, কাঠের তিন চারতলা বাড়ি, খরস্রোতা নদী এসবও রয়েছে সেই গ্রাম গুলোতে।

প্যাগোডা আর মন্দিরগুলোর পাথুরে শরীরে ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক ছবি খোদাই করা, কালের স্পর্শে কোথাও কোথাও সেগুলো অস্পষ্ট। সাদামাঠা শ্বেতপাথরের মসজিদগুলোকে ফাঁকা জায়গা বেছে দাঁড় করানো হয়েছে, উঁচু মিনারের মাঝামাঝি একটা করে ঝুল-বারান্দা, আযান দেয়ার জন্যে মুয়াজ্জিন ওখানে উঠে যান।

ঘণ্টাকৃতি বেতের ঝাঁকা নিয়ে বসে আছে গ্রামবাসীরা উঠানের চারদিকে। ঝাঁকার ভিতর শিকারী মোরগ। মোরগের লড়াই বালিনিজদের নিত্যদিনের আনন্দের খোরাক, সেইসঙ্গে কারও কারও পেশাও বটে।

যুবতীদের মাথার খোঁপা একদিকের কানের ওপর বসানো, বিদেশী রানাকে দেখে সেই খোঁপার দিকটা সামনে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ। সকৌতুক হাসিতে ফেটে পড়ছে রেবেকা, যুবতীরা লজ্জা ভুলে চমকে ফিরে তাকাচ্ছে। ওদের নব দম্পতি ভেবে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী হাসছে, কোলে শিশু। একদল যুবক একদল কিশোরী ও যুবতীর পিছু পিছু হাততালি দিতে দিতে গ্রামে ঢুকছে, দু'দলই ভিজে কাপড়ে উঠে এসেছে নদী থেকে।

আর ধান খেতে সোনালী ফসল।

তারপর, দূর পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ মখমলের মত কচি ঘাস, গরু-ছাগল-মোষ আর শূকরের পাল চরে বেড়াচ্ছে। রাখালের হাতে গাছের ভাঙা ডাল অথবা বাঁশের বাঁশি, বাতাসের সঙ্গে তাল রেখে সেই বাঁশি করুণ সুরে বিষণ্ন করে তোলে কাঠফাটা রোদের আকাশ।

গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবীর দল ওদের বাক্স-পেটরা বয়ে নিয়ে চলেছে। কাছেই পাহাড়, ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ। চোখ গরম করে ওপর থেকে চেয়ে আছে সূর্য। গন্তব্যস্থান বেদাবা গ্রাম।

চোখ জুড়ানো দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়ে দু'মাইল দূরত্ব পেরোতে এতটুকু ক্লান্ত হলো না রেবেকা। তারপর সামনে পড়ল উপত্যকা, নিচে অগভীর নদী। ভাটার সময়, তাই হেঁটেই পার হওয়া গেল।

উঁচু সুপারি গাছের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—বেদাবা। গ্রামের পেছন দিকে রাশভারী চেহারার একটা আগ্নেয় পাহাড় আয়েশের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ছে একটু একটু। সামনে ঘাসবন আর ধানখেত। আরেক দিকে বিস্তীর্ণ বনভূমি, এমন কি বুনো হাতি পর্যন্ত বসবাস করে ওখানে। দক্ষিণে নদী, নদীর ওপারে অন্য গ্রাম, তারপর খেত আর পাহাড়, তার ওপারে সাগর।

খেত থেকে শোরগোল তুলল একদল কৃষক। গ্রামের প্রবেশ পথে মঞ্চের ওপর দেখা গেল অ্যানাক অ্যাগাঙ কারাঙকে, গ্রামের মোড়ল সে। মঞ্চটা নব-দম্পতিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই তৈরি। টেলিগ্রামের স্বল্প পরিসরে কারাঙকে জানানো হয়নি যে ওদের বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গেছে।

এর আগে দু'বার বেদাবায় একটা করে রাত কাটিয়ে গেছে রানা। মঞ্চ থেকেই সহাস্যে হাত নেড়ে কিছু দেখাবার চেষ্টা করছে কারাঙ।

'কি দেখাচ্ছে ও?'

রানা বলল, 'গতবার একটা গ্যাস লাইটার দিয়ে গিয়েছিলাম ওকে। আমাকে ভুলে যায়নি, সেটাই বোঝাতে চাইছে কারাঙ।'

ওদের ঘিরে ধরল গ্রামের মেয়েরা। চারদিকে হাসি খুশি, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। চেনা নয় জানা নয়, অথচ কেমন আপন করে নিচ্ছে। রেবেকা মিশে গেল ওদের সাথে, যেন বাড়ির স্বজনদের মধ্যে কতদিন পর ফিরে এসেছে সে।

বেদাবায় ঢোকার মুখেই বিশাল-মন্দির। মন্দিরের ভিতর দিয়ে মোড়ল ওদের নিয়ে চলল আনন্দ-উদ্যানে। শাপলা ফুলে ঢাকা একটা পুকুরের সামনে থামল কারাঙ। পাথর দিয়ে বাঁধানো চারদিকের পাড়। পুকুরের একটা কোনার দিকে আঙুল তুলে দেখাল কারাঙ। পাথরের পাড়ের ওপর ছোট্ট একটা প্যাভিলিয়ন, ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া লাল টালির ছাদ দাঁড়িয়ে আছে চারটে মূল্যবান কারুকার্যখচিত পাথরের পিলারের ওপর। পুকুর ও তার বিপরীত দিকটায় কোন দেয়াল নেই। বাকি দু'দিকের দেয়ালের গায়ে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক দৃশ্য খোদাই করা। পুকুরের ওপারে নিচু উপত্যকা. সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য ধানখেত। রোদ লেগে সোনার মত চকচক করছে ফসল, বাতাস লেগে ঢেউ জাগছে। নেপথ্যে আগ্নেয়গিরি, যার ভিতর থেকে বেদাবা গ্রামবাসীদের পূর্বপুরুষরা বেরিয়ে এসেছিল উন্মুক্ত উপত্যকায়। অন্তত প্রচলিত কিংবদন্তি তাই বলে। সবশেষে কারাঙ নিজের নামের অর্থটাও জানাল রেবেকাকে: পর্বতপুত্র।

'ওই যে প্যাভিলিয়নটা দেখছ, ওটাই বেদাবার ব্রাইডাল চেম্বার। বর-কনের নিভৃত আশ্রয়। এ সম্পর্কে কনের মতামত জানতে ইচ্ছে করে,' বলল রানা।

'কনের বলার আছেটা কি?' সুরের ঝঙ্কার তুলে হাসল রেবেকা, 'কনে আনন্দেই আত্মহারা!'

কারাঙ শাপলা ফুলগুলো দেখিয়ে রেবেকাকে বলল, 'ওগুলো কিন্তু দিনের শাপলা নয়, রাতের শাপলা। সূর্যের আলো রয়েছে, তাই ওদের এমন পাপড়ি মুড়ে থাকতে দেখছেন। রাতে যদি চাঁদ ওঠে, দেখবেন সব ফুল মেলে দিয়েছে সব পাপড়ি। সকালে গুটিয়ে যাবে আবার।'

প্যাভিলিয়নের শ্বেত পাথরের সিঁড়ির ওপর বসল ওরা। কান থেকে তামাক

পাতার আধপোড়া চুরুট বের করে ছোট ছোট ছেলেরা ধূমপান করছে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। ব্যাগ থেকে চারটে প্যাকেট বের করে সিগারেট অফার করল রানা। যুবতী মেয়ের দল যার যার সিগারেট ধরিয়ে নিল রেবেকার হাতের লাইটার থেকে।

খেতের দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে গেল রানার। চোখের সামনে ভেসে উঠল কিংস্টনের খামার-বাড়ি। মনে পড়ল, শস্যাগারের দোচালাটা মেরামত করতে হবে, মদ তৈরির কারখানায় ডাবল শিফটে কাজ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে, ডেয়ারী ফার্মের জন্যে মেশিনপত্রের অর্ডার দিতে হবে, বীজের স্টক বাড়াতে হবে আগামী বছরের জন্যে। হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল মনটা। একের পর এক কাজের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে প্রতিবার খামার-বাড়ির একটা না একটা অংশের ছবি। জোনাকজ্বলা রাত, ঝুল-বারান্দায় ফুরফুরে বাতাসের মধ্যে বসে আছে ও আরাম কেদারায়, পাশে রেবেকা, চাঁদের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সব।

বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল রানার

চারটে দিন ঝটপট উড়ে গেল কিভাবে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে ওরা টেরই পেল না। পঞ্চম দিন সকাল বেলা। আগ্নেয়গিরির কাঁধের ওপর সূর্যের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে, কচি রোদ লেগে চকচক করছে রেবেকার এলোমেলো চুল। পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে আসছে কাশমা কফি নিয়ে। মাথার ওপর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি বাজনার শব্দ নেমে আসতে ওরা দু'জনেই চোখ তুলে তাকাল। কারাঙের কবুতরের ঝাঁক, উড়তে শুরু করেছে আকাশে। ওদের পাখনার নিচে ছোট আকারের বাঁশি বাঁধা, গোত্তা দিয়ে নিচে নামার সময় হুইসেলের মত তীব্র শব্দে বাজে সেগুলো। লাল-সাদা শাপলাগুলো পাপড়ি বন্ধ করছে অতি সন্তর্পণে, সূর্যকে তাদের বড় লজ্জা।

নতুন আর একটা দিনের শুরু।

আজ রাতে বানর-নাচ, তারই প্রস্তুতি চলছে গ্রামের পেছন দিকে, বনভূমির কিনারায়। বেলা একটু চড়তে কারাঙ ওদের সাথে করে নিয়ে গেল আয়োজন দেখাতে। খুব বড় উৎসব, তাই ব্যাপক আয়োজন। গোটা গ্রাম আজ দেশী মদে সাঁতার কাটবে। দুপুর থেকেই বসল মেলা।

দুপুরটা সবচেয়ে আরামের। সুইমিং কস্টিউম পরে পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে ডুব সাঁতার। শুধু ওরা দু'জন।

তারপর হাত ধরাধরি করে মেলার ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলা। এক সময় তো রেবেকা বলেই ফেলল, 'যদি থেকেই যাই এই অজ পাড়াগাঁয়, মন্দ কি!'

তারপর কখন যেন ছেড়ে দিয়েছে ওরা পরস্পরের হাত। বাঁশের তৈরি

হালকা শৌখিন জিনিস কিনছিল ওরা, গ্রামবাসীদের উপঢৌকন দেবার জন্যে। পিছু পিছু ঘুরছিল মাথায় ঝাঁকা নিয়ে একটি কিশোর। তাকে ওরা হারিয়ে ফেলল। কিভাবে, তা দু'জনের কেউ বলতে পারবে না। এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কোন কথা বিনিময়ও হলো না।

মেলা দেখাটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। মশালের আলো জ্বলে ওঠার পর রেবেকার অস্থিরতা সংক্রামিত হলো রানার মধ্যেও।

কি হয়েছে, তা রেবেকা বলেনি রানাকে। রানাকে স্তম্ভিত দেখাচ্ছে, সে-ও নির্বাক। ওদের এই পরিবর্তন লক্ষ করে চিন্তিত হলো কারাঙ।

বানর-নাচ উপলক্ষে পঁচিশটা শুয়োর আর দশটা খাসীর ছাল ছাড়িয়ে গনগনে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। সিংহল দ্বীপ থেকে আমদানী করা মশলার গন্ধে বাতাস ভারী। সেখানে পৌঁছুতে ছুটে এল কারাঙ। 'কি হয়েছে মেমসাহেব আপনাদের?' সবজান্তার মত মাথা দোলাল সে, 'নিশ্চয়ই দুই মনের মধ্যে কঠিন প্যাঁচ লেগেছে। ঠিক হ্যায়, সূত্র দিন, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি প্যাঁচ

ইচ্ছা করেই রানার দিকে তাকাল না রেবেকা। হাসিটা ম্লান, 'না, মোড়ল, ঝগড়া হয়নি আমাদের। আমার শরীরটা খারাপ, তাই ওর মন খারাপ।'

রানা নির্বাক, উদাসীন। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন প্রসঙ্গটা সম্পর্কে সচেতনই নয়।

রাতে শুরু হলো বানর-নাচ।

সারা গায়ে উজ্জ্বল লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ রঙ মেখে তৈরি হলো পঞ্চাশজন নৃত্যশিল্পী, মুখে বানরের মুখোশ। সব মশাল নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে জায়গা ছেড়ে দেয়া হলো। কুকুর, শিয়াল আর মোরগের কণ্ঠস্বর নকল করে ডেকে উঠল ছেলেদের দল। কারাঙের হাতের ছয় ব্যাটারিওয়ালা টর্চটা জ্বলে উঠতে দেখা গেল আকাশের গায়ে একশো লাল হাত নাচছে। ঠিক সেই সময় কাশমা রেবেকার পাশ থেকে আঁৎকে উঠল।

পরিষ্কার উচ্চারণে কয়েকটা শব্দ আওড়াল কাশমা। শুনতে পেল রেবেকা শুনতে পেল রানা।

দু'জনের কেউই কথা বলল না। এমন কি পরস্পরের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ঘন ঘন দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে কাশমা। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মুখটা। ঢোল আর করতাল বেজে উঠল এই সময়। একশোটা লাল পঞ্চাশজন লোকের দু'পাশে নামছে, পরমুহূর্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে মাথার ওপর খাড়া হয়ে উঠছে, দ্রুত থেকে দ্রুততর ছন্দে। উদ্দাম হয়ে উঠল বাজনার তাল বুড়ো-বুড়ীরা বাজনার সাথে তাল মিলিয়ে গান ধরল। অদম্য চিৎকারটা বেরিয়ে আসছিল কাশমার গলা চিরে। হঠাৎ তার দিকে ফিরল রেবেকা: 'চুপ!'

প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেও রহস্যময় মৌন ভাঙল না রানা ও রেবেকার।

খাটের ওপর শুয়ে মশারির ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে রানা। আকাশ পাড়ি দিচ্ছে রুপোলি চাঁদ, বড় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসছে তাকে গ্রাস করতে।

বুকটা কেঁপে গেল রানার। রেবেকার একটা হাত চেপে ধরল ও।

থরথর করে কেঁপে উঠল রেবেকা।

খানিকপর মৃদু, প্রায় শোনা যায় না, রেবেকার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পেল রানা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও, কিন্তু সান্ত্বনার কোন কথা শোনাল না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। রেবেকা দেখল চোখের পলকে উঠে বসেছে রানা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওর হাতের পিস্তলটা।

সেফটি-ক্যাচ অফ করল রানা। সব মনোযোগ একত্রিত করে চেয়ে আছে ও পঞ্চাশ হাত দূরের একটা ঝোপের দিকে।

ঝোপটা নাড়া খেয়ে দুলছে এখনও।

নিস্তেজ হতে হতে থেমে গেল দোলাটা। পাথরের মূর্তির মত অনড় বসে আছে রানা। চোখে পলক নেই।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রেবেকা, 'কারাঙের লোক দু'জন পাহারা তো দিচ্ছেই।'

উত্তর না দিয়ে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হাতের পিস্তল রেখে দিল বালিশের তলায়। রেবেকা বাইরে তাকাতে দেখল ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা একটা ইঁদুর। তবে দূর থেকে ঠিক চিনতে পারল না সে, ওটা খরগোশও হতে পারে।

রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিল রানা। মসজিদ থেকে মোয়াজ্জিনের আযানের শব্দ থামতে রেবেকা বলল, 'এভাবে জাগলে যে শরীরটার বারোটা বাজবে! খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, আমি জেগে থাকব।'

চোখ বুজল রানা। কিন্তু ঘুমুতে পারল না। কখন যেন তন্দ্রা মত এসেছিল, কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে একটা বাজ পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসল খাটে। মশারির বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেল না ও, দিগন্ত জুড়ে মেঘের কালো ছাদ আড়াল করে রেখেছে আলো।

সকালের বেশিরভাগটা কাটল প্যাভিলিয়নেই। বেলা সাড়ে দশটার দিকে পর্দার আড়ালে চলে গেল রেবেকা, পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল সুইমিং কস্টিউম পরে। 'তুমি?' সংক্ষেপে জানতে চাইল সে রানার চোখে চোখ রেখে।

'না,' বলল রানা, 'চলো, তোমাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পৌঁছে দেয়ার নাম করে রেবেকা যতক্ষণ সাঁতার কাটল, পুকুর পাড় ছেড়ে নড়ল না রানা।

দিনটা কাটল ঢিমে তালে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলল না কেউ। ভুলক্রমেও কারও মুখে হাসি ফুটল না। নীরবতা অস্বস্তিকর, অনুভব করছে

দু'জনেই, কিন্তু তা ভাঙবার উৎসাহ নেই কারও মধ্যে। প্রসঙ্গটা সম্পর্কে দু'জনেই অতিমাত্রায় সচেতন, কিন্তু উত্থাপন করতে আগ্রহী নয় দু'জনের কেউই।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যেতে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে এল কারাঙ। 'ওলাঙ আর নারাকুন সারারাত জেগে পাহারা দেবে, সাহেব। আপনি যদি বলেন, আরও ক'জনকে পাহারায় বসাতে পারি।'

রানা বলল, 'তার দরকার নেই, কারাঙ। দু'জনই যথেষ্ট। তবে, ওদেরকে বলো, আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে যায়। পাশের গ্রামে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছ তুমি?'

'জ্বী, সাহেব,' কারাঙ বলল, 'ওদের মোড়ল জানিয়েছে, নতুন কেউ রাতে ছিল না গ্রামে। তবে দিনের বেলা একজন...'

'তার মানে গত রাতেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে?' হঠাৎ সাগ্রহে জানতে চাইল রেবেকা।

'হ্যাঁ,' বলল কারাঙ।

রেবেকা তাকাল রানার দিকে। দু'চোখে তার আশার আলো। কিন্তু রানা উৎসাহবোধ করছে না দেখে কালো হয়ে গেল ওর চেহারা। দূর আকাশের দিকে চেয়ে আছে রানা, এ জগতেই যেন নেই ও।

কারাঙ চলে যেতে কোমরে ধারাল ভোজালি নিয়ে ওলাঙ আর নারাকুন এল। ওদের সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলল রানা। ওরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে গ্যাসস্টোভ জ্বেলে কেটলি চড়াল রেবেকা।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রেবেকা দু'বার নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তৃতীয়বার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে পারল সে।

দাতাকুর নাম উচ্চারণ করল না ওরা কেউ। গতকাল মেলায় তাকে দেখা গেছে, কিন্তু, দু'জনের মধ্যে কে প্রথম তাকে দেখেছে, এ-সম্পর্কেও পরস্পরকে কিছু জানাল না ওরা।

রেবেকা বলল, 'কোথাও গুরুতর একটা ভুল হয়ে গেছে, রানা। সে যাক, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রেবেকা এখন বুঝতে পেরেছে যুদ্ধটা করছে ওরা মৃত্যুর সঙ্গে।

ম্লান হাসল রানা। রেবেকা কি চাইছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ওকে আড়াল করে রেখে বিপদটার সামনে দাঁড়াতে চাইছে সে। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। 'আগামীকাল আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি,' বলল ও, 'লোমবুক অথবা ম্যাকাসারের একটা না একটা বোট পাওয়া যাবেই...'

'কি লাভ! ওই লোকটাও কি পিছু নেবে না? তোমার কি মনে হয়, রানা, এখানে সুবিধা করতে পারবে না ভেবে ফিরে গেছে সে?'

'না,' বলল রানা, 'ফিরে যাওয়ার লোক সে নয়। গতরাতে সে এই গ্রামেই ছিল, রেবেকা। পাশের গ্রামের মোঁড়ল তাই তাকে দেখতে পায়নি।'

'আজও তাহলে...?' কথাটা শেষ করল না রেবেকা। মাঝ পথে আপনা থেকে বুজে এল তার গলা।

উত্তর দিল না রানা। ভুলটা কোথায় হয়েছে তা বেদাবা গ্রামে দাতাকুকে দেখার পরই অনুমান করে নিয়েছে রানা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায় রেবেকা। গাড়িটা গড়িয়ে খাদে পড়তে কারাচ মারা যায়। রেবেকার মত দাতাকুও সময় মতই লাফিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি সে। গাড়িটি খাদে পড়লেও তাতে আগুন ধরেনি। হাইওয়ে দিয়ে কেউ যাচ্ছিল, খাদের নিচে ওল্টানো অবস্থায় একটা গাড়ি দেখে সে থেমে আহতদের উদ্ধার করার জন্যে নামে খাদে। দাতাকু এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, খুন করে সে লোকটাকে। তাকে নিজের গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারপর তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঝম ঝম করে একনাগাড়ে তুমুল বৃষ্টি নামল রাতেও, মুখ দেখাবার সুযোগই পেল না চাঁদ।

মশারির ভিতর ঘুমন্ত রেবেকার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে অন্ধকারের নড়াচড়া দেখছে রানা।

বৃষ্টি থামল ভোরের দিকে। উপত্যকা থেকে কুল কুল শব্দে ধানখেতে পানি নামছে, তারই একটানা আওয়াজের সাথে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। গত পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি রানা। বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করল ওর, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল তা ও নিজেও জানে না।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। রেবেকার আর্তচিৎকার কানে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে গেল রানার। ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসল ও। চোখের পলকে বালিশের তলা থেকে বের করে নিল পিস্তল আর টর্চটা।

'রানা!' রেবেকার দু'চোখ ভরা আতঙ্ক, 'কি যেন কামড় দিল আমাকে...'

সাপ? শিউরে উঠল রানা। 'কোথায়?' হঠাৎ টর্চ ধরা হাতটা কেঁপে গেল। আলো পড়তে মশারির দেয়াল ঘেঁষে কি যেন একটা চকচক করে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা।

'হাতে!' রেবেকা ঢোক গিলে বলল। ভয়ে নীল হয়ে গেছে মুখটা।

এটা কোত্থেকে এল এখানে? টর্চের আলোয় হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা দেখে ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল ও। খালি।

মাথাটা ঘুরে গেল রানার, কি ছিল সিরিঞ্জে?

'রানা, তুমি...!'

লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা সিরিঞ্জটা, কিন্তু দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে

সেটা কেড়ে নিল রেবেকা ওর হাত থেকে। 'কি এটা? কোত্থেকে এল…' কথা শেষ করতে পারল না রেবেকা, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল তার।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা তিন সেকেন্ড। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রেবেকা, 'রানা!'

হিম হয়ে গেল রানার বুক। রেবেকাকে কাছে টেনে নিয়ে বাহুটা দেখল ও। সুচ ফোটার লাল বিন্দুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাদা চামড়ার ওপর।

রেবেকাকে এক হাতে ধরে রেখে মশারি তুলে বাইরে তাকাল রানা, হাতে ওয়ালথার। অন্ধকারে মিশে গেছে দাতাকু। আবার সে ছোবল মেরে পালিয়েছে নাগালের বাইরে।

'শহরে যেতে হবে, এদিকে কোন ডাক্তার নেই।' দু'হাত দিয়ে রেবেকার মুখটা ধরল রানা। কাঁপছে হাত দুটো। রেবেকার কপালে চুমো খেল ও। 'ভয় পেয়ো না, রেবেকা,' নিজের কানেই নিস্তেজ শোনাল কথাটা। 'সিরিঞ্জের ভেতর হয়তো শুধু ডিসটিল্ড ওয়াটার ছিল। ভয় পাওয়াবার জন্যে…' কথাগুলো নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। খাট থেকে নেমে আকাশের দিকে পিস্তল তুলে পরপর দুবার ফাঁকা আওয়াজ করল ও। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে গ্রাম থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। ভুরু কুঁচকে সামনের অন্ধকার দেখল রানা পনেরো সেকেন্ড। ওলাঙ আর নারাকুন করছে কি?

একটা আশঙ্কার কথা মনে উদয় হতে মুখটা কঠোর হয়ে উঠল রানার। মশারি তুলে দিয়ে খাটের উপর বসল ও।

'আমি যদি মারা যাই…'

রেবেকার মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল রানা। 'মনটাকে শক্ত করে রাখতে হবে, রেবেকা,' কেঁপে যাচ্ছে রানার গলা। বৃষ্টিস্নাত গ্রামের ওপর ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পাহাড় থেকে, তবু ফোঁটা ফোঁটা ঘামে রানার মুখটাকে দেখাচ্ছে জলবসন্তে আক্রান্ত রোগীর মত। 'মনে করো, কিছুই হয়নি তোমার।'

'রানা! রানা, আমি ভয় পাচ্ছি না!' মনের ভয়টাকে তাড়াবার জন্যেই যেন চিৎকার করে উঠল রেবেকা।

কি ছিল সিরিঞ্জের ভিতর? গন্ধ শুঁকে কিছুই বোঝেনি ও। বিষ?

রেবেকার মুখ থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না রানা। এখন পর্যন্ত আতঙ্কের ছায়া আর ঘাম ছাড়া কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দ্রুত ভাবছে রানা, দাতাকু ড্রাগ এডিক্ট, অনেক আগে এইরকম কি যেন একটা একবার শুনেছিল ব্যাঙ্ককে থাকতে। ড্রাগ এডিক্ট বলেই কি সে সঙ্গে সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছে বেদাবায়? কোকেন…হেরোইন…না অন্য কিছু ইঞ্জেক্ট করেছে সে রেবেকার শরীরে? নাকি শুধু পানি?

অসম্ভব! দাতাকুর ছোবলে বিষ না থেকেই পারে না। তার সম্পর্কে এটক

অন্তত জেনেছে রানা।

জেগে উঠেছে গোটা গ্রাম। টর্চের আঁকাবাঁকা আলো ছুটে আসছে একটা। পেছনে মশাল হাতে আরও লোকজন।

কারাঙ হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল প্যাভিলিয়নে। 'কি হয়েছে, সাহেব! গুলির শব্দ শুনে···কিন্তু ওলাঙ আর নারাকুন কোথাও নেই, ব্যাপার কি কিছুই বুঝছি না, সাহেব।'

কারাঙের বউকে সাথে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এল কাশমা। 'কড়া করে প্রচুর কফি তৈরি করো,' দ্রুত হুকুম করল রানা।

কারাঙকে সংক্ষেপে বিপদটা বুঝিয়ে দিতে যা দেরি, ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই দ্রুত স্বেচ্ছাসেবীদের একটা দল তৈরি করতে রওনা হয়ে গেল সে।

'কেমন বোধ করছ, রেবেকা?' অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের বুকের সাথে চেপে রাখল রেবেকা। হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। 'তো-মা-কে ছেড়ে আ-মি যাব-না!' কেঁপে গেল রানার গোটা অস্তিত্ব, এখন আবেগান্বিত হলে চলবে না। কিন্তু রেবেকাকে অভয় দেয়ার ভাষাও খুঁজে পেল না ও। দ্রুত ভাবছে রানা, দাতাকু যদি কোকেন ইঞ্জেক্ট করে দিয়ে থাকে, রেবেকা তাহলে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তারপর ফ্যাকাসে হয়ে যাবে চেহারা আর ভয়ানক ছটফট করতে থাকবে, কেউ ধরে স্থির রাখতে পারবে না ওকে। হাঁপাবে। দু'তিন গজ দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যাবে ওর হার্টবিটের শব্দ। বেতস পাতার মত কাঁপবে ও। এবং এ সবের মধ্যেই কোন একসময় হয়তো শেষ নিঃশ্বাস···

নিজেকে সামলে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রেবেকা। জোর করে হাসতে চেষ্টা করছে সে, তা কান্নারই নামান্তর হয়ে ফুটে উঠল চোখেমুখে। স্যান্ডেল জোড়া তার পায়ে গলিয়ে দিল রানা। কিন্তু ওর হাত সরিয়ে দিয়ে নিজেই স্ট্র্যাপ লাগাতে শুরু করল রেবেকা।

রানা ভাবছে, রেবেকার শরীরে যদি মরফিয়া ইঞ্জেক্ট করা হয়ে থাকে, ঘুম পাবে ওর। যে-কোন ভাবে জাগিয়ে রাখতে হবে ওকে, ঘুমুতে দেয়া চলবে না কিছুতেই, ডোজ যদি বেশি হয়ে থাকে, ঘুম মানেই তাহলে হবে মৃত্যু।

পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল কারাঙ। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাঁশের তৈরি মশাল। না, রানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল কারাঙ, ওলাঙ আর নারাকুনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই গ্রামের কোথাও। একদল লোক লাগিয়ে দিয়েছে সে, তারা খুঁজে দেখছে এখনও। সবশেষে সে বলল, 'দু'জন লোককে তামপুরাল গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, সাহেব। ওখানে গাড়ি আছে, ড্রাইভার আমাদের পৌঁছুবার অপেক্ষায় তৈরি হয়েই থাকবে। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে শহরে যেতে আর কোন অসুবিধা নেই।'

কাশমা বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে। দিশেহারার মত লাগছে তাকে। রানার সামনে এসে দাঁড়াল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি বাইরে অন্ধকারের দিকে। কি যেন আশঙ্কা করে কেঁপে উঠল সে।

থার্মোসটা কাশমার হাত থেকে নিয়ে রেবেকাকে কফি খাওয়াল রানা।

মাথার ওপর মেঘের ছাদ যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ছোট্ট দলটা রওনা হলো তামপুরালের উদ্দেশে।

মশাল হাতে গ্রামবাসীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন অচেনা শত্রুকে খুঁজছে তারা। কিন্তু রানা জানে, দাতাকুকে গ্রামের ভিতর তো নয়ই, আশপাশের কোথাও পাওয়া যাবে না। এরই মধ্যে শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে। জানে, রেবেকাকে নিয়ে রানাও শহরে যেতে বাধ্য।

রানার হাত ধরে হাঁটছে রেবেকা। তিনজন মশালধারী যুবক সামনে, দু'জন পেছনে। দু'পাশে কারাঙ ও কাশমা।

'হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, রেবেকা?'

'না,' রেবেকা বলল, 'রানা, আর এক কাপ কফি খাব?'

সম্ভবত কোকেন, ভাবল রানা। কাজ শুরু করে দিয়েছে রেবেকার শরীরে। বুঝতে পারলেও কিছু বলল না ও। শঙ্কিত দৃষ্টিতে শুধু দেখল, কাশমার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে থার্মোসটা কেড়ে নিল রেবেকা।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে কাশমা তাকাল রানার দিকে।

আবার হাঁটতে শুরু করে রেবেকা বলল, 'এখন যেন আগের চেয়ে ভাল লাগছে,' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে হাতটা রানার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরল সে। টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিল। তারপর বমি করে ফেলল হড়হড় করে।

ঘুম থেকে জেগে উঠল যেন রানা। কোকেন! এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝল ও, সত্যি সত্যি ওর সর্বনাশ করে গেছে দাতাকু।

***

প্রতিদ্বন্দ্বী-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮

এক

পা টানতে কষ্ট হচ্ছে রেবেকার। রানা আর কাশমা দু'দিক থেকে ওর দুটো হাত নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। তিন মিনিট যেতে না যেতে রানার কাঁধে মাথার ভার চাপিয়ে দিল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছে। 'আমি আর পারছি না!' উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠল রেবেকা, 'রানা, আমি আর হাঁটতে পারছি না!'

পিছন দিকে তাকাল রানা। পাঁচশো গজও এগোয়নি ওরা। তামপুরাল গ্রাম এখনও পৌনে দু'মাইল।

'রেবেকা, রেবেকা, তোমাকে হাঁটতে হবে!' রেবেকার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল রানা। 'তামপুরালে একবার পৌঁছুতে পারলে…'

'না-না! হাঁটতে বোলো না আমাকে, প্লীজ, রানা! আমি আর পারব না…মাগো! এত ঘুম! কোথায় ছিল! কি ভীষণ শীত করছে আমার…মাগো…' ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করল রেবেকা।

ঘুম! মরণঘুম! ঢোক গিলে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে রানা। রেবেকার একটা হাত চেপে ধরল ও, অন্য হাতটা পিঠের উপর দিয়ে তুলে দিল কাঁধে। 'সময় নষ্ট কোরো না, রেবেকা! হাঁটতে তোমাকে হবেই, এছাড়া উপায় নেই।'

যতক্ষণ সম্ভব হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে, ভাবছে রানা। ঘুম তাড়াবার এখন এটাই একমাত্র উপায়।

সামনে চড়াই-উৎরাই।

ওঠার সময় রেবেকাকে টেনে তুলল রানা। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে রেবেকা। নামার সময় প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার উপক্রম করছে।

'রানা! রানা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না!' গলার স্বরটা কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না, প্রতিটি শব্দ চিৎকার করে উচ্চারণ করছে রেবেকা, 'ওহ্, রানা! তুমি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছ কেন আমার সাথে? আমাকে কাঁধে তুলে নাও! দেখতে পাচ্ছ না, হাঁটতে পারছি না আমি?'

'হাঁটতে হবে, রেবেকা,' কঠিন শোনাল রানার গলা। পরমুহূর্তে নরম সুরে বলল, 'রেবেকা, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তা আমি চাই না। এই শোনো, তোমাকে আমাদের খামারবাড়ির গল্প শোনাই। খুব মন দিয়ে শোনো, কেমন?

মন দিয়ে শুনলে তোমার আর ঘুম পাবে না।'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রেবেকার। ঘামে চকচক করছে মুখ। চোখ দুটো লালচে। নাকের দু'পাশ ফুলে ফুলে উঠছে। মাথা কাত করে রানার কথায় সায় দিল সে।

'তুমি একটু সুস্থ হলেই আমরা কিংস্টনে ফিরে যাব, রেবেকা,' মৃদু কণ্ঠে শুরু করল রানা, 'বিলি একটা কুকুর সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছে, কথাটা যদি ভুলে যাই, তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো। আগামী বছর সম্ভবত আমাদের সংসারে নতুন একজন অতিথি আসবে, তার নাম···কি নাম রাখবে তার, রেবেকা, কিছু ভেবেছ?'

রেবেকার শরীরের প্রায় সবটুকু ভার এখন রানার কাঁধে। থেমে থেমে পা ফেলছে রেবেকা। বারবার থেমে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে অগ্রবর্তী দলটা।

'আমার মাথায়···কিছু একটা দিয়ে বাড়ি মারো, রানা!' আর চিৎকার নয়, বিড় বিড় করছে এখন রেবেকা। রানার পিঠ খামচে ধরছে মাঝে মধ্যে। মুখ ঘষছে কাঁধে। নেশাগ্রস্ত মাতালের মত আচরণ। কাশমাকে আরও একবার কফি ঢালতে বলে থামল রানা।

পুরো এক কাপ কফি খাওয়ানো হলো রেবেকাকে। তিনটি মূল্যবান মিনিট বেরিয়ে গেল এরই মধ্যে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত।

উত্তপ্ত কফির কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে একবার শুধু তাকাল রেবেকা। উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করে রানা চাপা কণ্ঠে ডাকল, 'রেবেকা!'

চিনতে পারল না রেবেকা। না কণ্ঠস্বর, না চেহারা। কোন সাড়া না পেয়ে রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ।

হাঁটা শুরু করার মিনিট দুই পর আবার থামল ওরা। পিছন দিকে তাকাল রানা। দুটো মশাল দেখল ও। গ্রামের দিক থেকে লোক ছুটে আসছে, তাদের চিৎকার শুনল ও। ওদের পিছনে রেখে এগিয়ে গেল কারাঙ। পঁচিশ গজ সামনে এগিয়ে লোক দু'জনের সাথে মিলিত হলো সে।

সম্পূর্ণ অন্যরকম চেহারা নিয়ে ফিরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল কারাঙ। ভূত দেখে বোবা হয়ে গেছে যেন। কথা নেই মুখে।

হাত দুটো একবার মুষ্টিবদ্ধ হলো রানার। বলতে হলো না, কি ঘটেছে অনুমান করতে পারছে ও। কারাঙের কাঁধে হাত রাখল রানা।

'গ্রামে খবর পাঠিয়ে দাও, তুলাঙ আর নারাকুনের খুনের বদলা নেয়া হবে!'

'সাহেব আপনি জানেন!' কেঁদে ফেলল কারাঙ।

'জানি,' বলল রানা, 'যাও কারাঙ, দেরি কোরো না। সময় মত পৌঁছুতে না পারলে রেবেকাকেও···'

ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল মুষলধারে। এরইমধ্যে উলেন সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছে কাশমা রেবেকাকে। রেইনকোট আগেই বের করে রেখেছে সে ব্যাগ থেকে, রানার সাহায্য নিয়ে সেটাও সে পরিয়ে দিল।

রেবেকাকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে তুলে নিল রানা। কি ঘটছে জানতে পারছে না রেবেকা এখন। শুধু বিড় বিড় করছে, বোধহয় নিজেরই অজ্ঞাতে, 'আমি স্বাভাবিক আছি···রানা, আমি···'

ভেজা, পিচ্ছিল পথ। উপত্যকা থেকে তীর বেগে নেমে আসছে পানির তোড়। ধাক্কা দিয়ে মাটি থেকে পা সরিয়ে দিতে চাইছে। আর বৃষ্টি! চোখেমুখে বর্শার মত বিঁধছে অসংখ্য, অবিরাম। বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে রানা।

ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে সামনের জায়গাটা। রেবেকাকে বুকে নিয়ে সহজ একটা পথ খুঁজছে রানা। একবার এদিক, একবার ওদিক তাকাচ্ছে। বৃষ্টির জলের ভিতর দিয়ে বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। খানিকদূর এগিয়ে সুবিধে হবে না ভেবে আবার পিছিয়ে আসছে ও। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ। অবশেষে বিরক্ত হয়ে প্রায় খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া পথটাই বেছে নিল ও।

এক পা সামনে ফেলল রানা, পাঁচ সেকেন্ড সময় নিল তাল সামলাতে, তারপর পিছনের পা তুলল। পা হড়কাল বুঝি! ভয়ে ভয়ে কয়েক হাত ওঠার পর ঘাড় ফিরিয়ে ও দেখল কারাঙ প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে ওর পিছু পিছু। সকলের পিছনে কাশমা, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠছে সে।

সময় নেই, সময় নেই! বৃষ্টির একঘেয়ে আওয়াজের ভিতর থেকে সতর্ক-বাণীটা কানে ঢুকছে রানার।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গেলে পিছলে যাবে পা, গড়িয়ে নিচে পড়তে হবে রেবেকাকে নিয়ে।

উপরে উঠে অপর দিকে ঘাসবন দেখতে পেল রানা। ক্রমশ নেমে গেছে জায়গাটা। ঘাসবন নুয়ে পড়েছে পানির স্রোতে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে এতক্ষণে। অস্পষ্ট আলোয় বেলে মাটির বিশাল একটা প্রান্তর দেখল ও, তারপর নদী।

নামার সময় আরও সতর্ক হলো রানা। পা দুটো অবাধ্য হয়ে উঠতে চাইছে প্রতি মুহূর্তে, দাঁতে দাঁত চেপে শরীরের ভার শাসনে রেখেছে ও। ছুটে নেমে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে মাঝে মধ্যে মনটা।

নদীর কিনারায় পৌঁছে দমে গেল রানা। প্রবল বৃষ্টিতে নদীর দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে। মাটির উপর রেবেকাকে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দু'কোমরে হাত রেখে তাকাল নদীর দিকে। এই খরস্রোতা নদী হেঁটে পার হওয়া···অসম্ভব!

'বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, সাহেব,' কারাঙ বলল।

কে জানে কখন বৃষ্টি থামবে! তারপরও নদী শান্ত হতে কমপক্ষে দু'ঘণ্টা! উদভ্রান্তের মত নদীর এদিক ওদিক তাকাল রানা। খাঁ খাঁ করছে দুই তীর। নৌকো, ভেলা, গাছের গুঁড়ি—কোথাও কিছু নেই।

'কাছের গ্রামটা কত দূর? দড়ি নিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বিশ মিনিটের কম নয়, সাহেব,' কারাঙ বলল।

'পাঠিয়ে দাও একজনকে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরতে পারলে একশো টাকা বকশিশ।'

এক যুবককে নির্দেশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কারাঙ, রানা নদীতে নামতে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল সে। 'করছেন কি, সাহেব! এ নদী বড় ভয়ঙ্কর—নামলেই কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, কোন খোঁজই পাওয়া যাবে না আর।'

ইতস্তত করল রানা। বৃষ্টির বেগ কমে আসছে এখন।

হাত নেড়ে কারাঙকে কাছে ডাকল ও। কাছে আসতে তার হাত থেকে মশালটা নিয়ে রানা বলল, 'এখনই নদী পার হতে হবে, কারাঙ। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় কি!' মশালের মাথাটা পানিতে নামিয়ে দিল ও। ধীরে ধীরে গোটা মশাল, তারপর রানার হাতের কনুই পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে। এতক্ষণে তল পাওয়া গেল নদীর।

মশালটা তুলে কারাঙের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। মাথাটা ধরে কারাঙ বলল, 'অন্য দিকটা আপনিও ধরে থাকুন!'

ঝুপ্ করে নামল রানা পানিতে। বুক পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল ওর। পানির তলার মাটিতে পা পড়লই না, হেঁচকা টান দিল তীব্র স্রোত।

থরথর করে কাঁপছে কারাঙের হাত দুটো। দু'হাত দিয়ে টেনে ধরে রেখেছে সে মশালের আগাটা। স্রোতের উপর সটান উপুড় হয়ে আছে রানা। মশালের অন্য প্রান্ত ধরে থাকা হাতটা বাহুমূল থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইছে।

হঠাৎ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল কারাঙের চোখ দুটো। প্রচণ্ড টানে হাত থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে যাচ্ছে মশালের প্রান্তটা। সাদা ফেনার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে রানার মুখটা। চেয়ে আছে ও কারাঙের দিকে। মশালটা যদি হাত থেকে ছুটে যায়, বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না রানাকে। কারাঙের মনে পড়ে গেল, গত বছর এই রকম বৃষ্টির দিনে নদী পেরোতে গিয়ে ভেসে গিয়েছিল কয়েকজন মানুষ, পরে অনেক খুঁজেও তাদের চিহ্নটুকু পাওয়া যায়নি।

কিনারায় পৌঁছুবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা। উন্মাতাল স্রোত সর্বশক্তি দিয়ে টানছে ওকে পিছনে। একই জায়গায় সাঁতার কাটছে রানা। এক ইঞ্চিও এগোতে পারছে না স্রোত ঠেলে।

দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরিয়ে এল কারাঙের গলা চিরে। তার সঙ্গী দু'জন মশালের আগাটা যখন ধরে ফেলল নিজের হাত দুটো তখন চোখের সামনে ধীরে ধীরে মেলে ধরল সে। দুটো তালুর উপর তাজা রক্ত, ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো।

কারাঙের সঙ্গী দু'জন নদী থেকে টেনে তুলল রানাকে। হাঁপাচ্ছে তখন রানা, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। নদীর দিকে একবার, তারপর রেবেকার দিকে তাকাল ও। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আপন মনে।

অসম্ভব এই নদী পার হওয়া।

ঠিক পনেরো মিনিটের-মাথায় কাছের গ্রাম থেকে দড়ি নিয়ে এল কারাঙের লোকটা। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই।

'রানা…রানা!' চোখ বুজে বিড় বিড় করছে রেবেকা।

গরম কফির কাপ ধরল কাশমা রেবেকার ঠোঁটে। চোখ মেলল না রেবেকা। ঠোঁটও খুলল না। চামচে কফি তুলে ঠোঁটে গুঁজে দিল কাশমা। কিন্তু ঢোক গিলল না রেবেকা। ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ল কফিটুকু।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে রেবেকার। বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত ঘষল রানা। দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করা মানে রেবেকাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া। না, তা হতে পারে না। অপেক্ষা করবে না রানা, আর একটুও না।

মাটি থেকে তুলে নিয়ে দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে ফেলল রানা। কারাঙকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। দড়ির একটা প্রান্ত বাঁধল কারাঙ বড় একটা পাথরের সাথে। অপর প্রান্তটা নিজের কোমরে বেঁধে নিল রানা।

রেবেকার সামনে গিয়ে বসল ও। আধবোজা চোখের ভিতর স্থির হয়ে আছে রেবেকার চোখের মণি দুটো। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। হঠাৎ বোঝা যায় না বেঁচে আছে কিনা। নাড়ি দেখল রানা।

চলছে। কিন্তু একে চলা বলে না। যে-কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। রেবেকার নাকের কাছে একটা হাত নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস কি রকম চলাচল করছে অনুভব করতে চাইল রানা।

সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল নিজের অজান্তেই। কঠোর একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল মুখের চেহারায়। কারও দিকে তাকাল না। একটু সরে রেবেকাকে পাশ কাটিয়ে পিছিয়ে গেল ও। দাঁড়াল। একবার নদীর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে তাকাল রেবেকার দিকে।

কড়-কড়-কড়াৎ…চমকে উঠল রানা বজ্রপাতের শব্দে।

ঝম ঝম করে ভেঙে পড়ল আকাশ। কপাল থেকে ভিজে চুল সরিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। ওর মুখের দৃঢ় ভাব দেখে বাধা দেয়ার কথা ভাবতেও পারছে না কেউ।

ছুটল রানা।

স্বল্প দূরত্ব পেরিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছুল, তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা। মাটিতে পড়ে থাকা দীর্ঘ দড়িটা দ্রুতবেগে নেমে যাচ্ছে পানিতে। স্রোত কোথায় নিয়ে চলেছে রানাকে, কারও চোখে ধরাই পড়ল না।

দড়ির দিক পরিবর্তন লক্ষ করে আঁৎকে উঠল কারাঙ। অপর পাড়ের দিকে নয়, নদী যেদিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেদিকে ঘুরে গেছে দড়িটা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। দেখতে দেখতে পড়ে থাকা সবটুকু দড়ি নেমে গেল পানিতে। হেঁচকা একটা টান পড়ল পাথরে। মাটি থেকে উঠে পড়েছে দড়ি। ধনুকের ছিলার মত টানটান এখন সেটা।

কিন্তু কোথায় রানা! কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না।

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে আছে কারাঙ সঙ্গীদের নিয়ে। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে না ওরা। নদীর যতদূর দেখা যায়, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে কয়েক জোড়া চোখের দৃষ্টি। অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা নাচানাচি করছে নদীর গায়ে। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেও ফুটছে না এখনও। চার দিগন্ত জুড়ে ঘন কালো মেঘের স্তর। উজ্জ্বল আলোর রেখা ছুটে যাচ্ছে মেঘের এক দিক থেকে আরেক দিকে। বিদ্যুৎ চমকের সাথে কান ফাটানো মেঘের গর্জন। বজ্রপাত।

সঙ্গীর চিৎকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কারাঙ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কারাঙ দেখল, দড়ি দিক পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। নদীর অপর পাড়ের দিকে ঘুরে যাচ্ছে সেটা।

ঝট্ করে নদীর দিকে আবার তাকাল কারাঙ। অবাক বিস্ময় ফুটে উঠল তার দু'চোখে। বহু দূরে কালো বিন্দুর মত কিছু একটা দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে।

একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে কারাঙ, রানাকে আবার দেখতে পাবে এই আশায়। আবার যখন পানির উপর মাথা তুলল রানা, আনন্দে লাফিয়ে উঠল কারাঙ। প্রথমবার যেখানে দেখা গিয়েছিল সেখান থেকে বিশ পঁচিশ হাত দূরে দেখা গেল মাথাটা। নদীর অন্য পাড় থেকে রানা আর মাত্র হাত পনেরো দূরে।

কারাঙ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তীরে উঠল রানা। হঠাৎ আতঙ্কে কেঁপে উঠল সে। তীরে উঠেছে রানা, কিন্তু নড়ছে না একটুও। লম্বা হয়ে পড়ে আছে ও, যেন একটা লাশ।

মারা গেছে? নিষ্প্রাণ দেহ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তীরে তুলে দিয়েছে তীব্র স্রোত? সঙ্গীদের দিকে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কারাঙ। ব্যাপার কি? কিছু বুঝতে পারছ তোমরা?

কথা নেই কারও মুখে। অনুচ্চারিত প্রশ্নটা সকলের মনে মাথা কুটছে। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় চারদিক এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মুহূর্তের জন্যে।

'রানা…রানা…,' বিড় বিড় করছে রেবেকা।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। বহুদূরে, নদীর অপর পাড়ে কয়েকজোড়া বিহ্বল চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ। বৃষ্টিতে ভিজছে রানা। ঢালু পাড় বেয়ে নেমে আসছে বৃষ্টির জলধারা, রানার শরীরে বাধা পেয়ে সরে যাচ্ছে দু'পাশে। এতটুকু নড়ছে না ও।

আরও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল রানা। দেড় মিনিটের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ও। নদীর ওপারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। খাঁ খাঁ করছে। কিছুই নেই। বুকটা ছ্যাঁত্ করে উঠল একবার। তারপর তীর অনুসরণ করে আরও দূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতেই চোখে পড়ল কয়েকটা কালো বিন্দু!

উঠে দাঁড়াল সে। কোমর থেকে দড়িটা খুলতে খুলতে হাঁটতে শুরু করল।

রেবেকাকে কাঁধে তুলে নিল রানা। এক হাতে দড়ি ধরে নদীতে নামল। স্রোতের টানে দড়ির গায়ে হেলে পড়ল শরীরটা। রেবেকা নড়াচড়া করছে। এক হাত দিয়ে তাকে কাঁধের সাথে ধরে রেখেছে ও। ভারসাম্য হারিয়ে দু'বার পড়ল রানা দড়ির উপর, কিন্তু দড়ি ওকে ঠেকিয়ে রাখল তাল সামলে না ওঠা পর্যন্ত।

কাঁধের উপর ক্রমশ যেন অস্থির হয়ে উঠছে রেবেকা। রানা অনুভব করল পিঠের চামড়া ভেদ করে মাংসে ঢুকে যাচ্ছে রেবেকার নখগুলো। উরুর উপর রেবেকার পায়ের ধাক্কায় হোঁচট খেতে খেতে প্রতিবার সামলে নিচ্ছে নিজেকে ও অলৌকিক ভাবে।

পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রানা। হাতের পেশী যন্ত্রণায় টনটন করছে। পা আর চলে না। কিন্তু তামপুরাল গ্রাম এখনও দেড় মাইল। হাঁটার গতি শ্লথ করার কথা ভাবতে পারছে না রানা, ভাবতে পারছে না দু'দণ্ড বিশ্রাম নেয়ার কথা। দুটো কি একটা মিনিটের হেরফেরে চরম সর্বনাশই ঘটে যাবে হয়তো।

এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে রেবেকা, আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। চূড়ান্ত ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছে রানার শরীর। দু'কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও। রেবেকা কি যেন বলতে চাইছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না ও।

'কিছু বলছ, রেবেকা,' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দম আটকে শুনতে চাইল।

দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই ঘাড় ফিরিয়েছে। রেবেকার কপাল থেকে বৃষ্টির পানি

তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল কাশমা। কারাঙ টর্চের আলো ফেলল। দেখা গেল, ঠোঁট জোড়া দুর্বলভাবে কাঁপছে ওর। পরমুহূর্তে সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রেবেকার।

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। কাঁধ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল রানা। দু'পা পিছিয়ে গেল কারাঙ ভয় পেয়ে।

কাশমার সাহায্য নিয়ে কাঁধ থেকে রেবেকাকে নামাতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ একেবারে নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ বোঝার মত হয়ে গেল রেবেকা।

পিচ্ছিল পথ ধরে ছুটল রানা।

বুঝতে পারছে, ও একাই ছুটছে না। ওদের দিকে, রেবেকার দিকে, তুমুল বেগে ছুটে আসছে আরও একজন। মৃত্যু!

ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া উপত্যকার গা বেয়ে কোনরকমে টলতে-টলতে উপরে উঠে রানার মনে হলো, জ্ঞান হারাচ্ছে ও। অথচ মাত্র তিনগজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাক্সিটা। ঠিক সময়ে ধরে ফেলল কারাঙ, মাথা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল, খোলা দরজার ওধারে গাড়ির ব্যাক সীটে নামিয়ে দিল রেবেকাকে। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গেল কাশমা, গ্রহণ করল রেবেকার দেহভার। সামনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'আমি ড্রাইভ করব,' কারাঙের দিকে ফিরল ও, একটা হাত ধরল তার, অন্য হাতে পকেট থেকে বের করে আনল মানিব্যাগটা। 'তোমাদের ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না, কারাঙ। আমার তরফ থেকে গ্রামবাসীদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ো। আর সামান্য এই টাকা ক'টা রাখো, ছেলেমেয়েরা মিষ্টি কিনে খাবে।' এক বান্ডিল নোট বের করে কারাঙের হাতে গুঁজে দিল ও। কারাঙ প্রতিবাদ করে কিছু বলতে শুরু করার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভিং সীটে বসল ও, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

প্রায় নির্জন সকাল। ফাঁকা রাস্তা। যান্ত্রিক মানুষের মত পিঠ টান করে বসে আছে রানা, সামনে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে। স্পীডোমিটারের কাঁটা পঞ্চাশ থেকে ষাট, ষাট থেকে সত্তর, সত্তর থেকে আশি, লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই ওর। ড্রাইভার কাঁদো-কাঁদো মুখে ঘনঘন তাকাচ্ছে ওর দিকে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের করবে সে সাহস আর হলো না।

একশো দশ মাইল রাস্তা নব্বই মিনিটে পেরোল রানা। পরিচ্ছন্ন একটা একতলা লাল ইঁটের বাড়ির সামনে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ট্যাক্সি। এক ঝটকায় দরজা খুলে নিচে নেমে পিছনের দরজা খুলে রেবেকাকে টেনে নিল

দু'হাত দিয়ে বুকে।

চোখ বুজে আছে রেবেকা। পাঁজরগুলো ঠেকে আছে রানার বুকে। তার হৃৎকম্পন অনুভব করতে চাইল রানা। কিন্তু কিছুই টের পেল না। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে রেবেকাকে। বোঝা যায় না বেঁচে আছে কিনা।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। কঠিন, কঠোর হয়ে উঠল মুখ। দাতাকুর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল ও।

দারোয়ান গেট খুলে দিতেই নিঃশব্দে ঢুকল রানা। প্রশস্ত রাস্তা, তারপর গাড়ি-বারান্দা। তিনটে সিঁড়ির ধাপ টপকে বড় একটা হলরুমে ঢুকল ও। ইমার্জেন্সী লেখা দরজাটায় পা দিয়ে ধাক্কা মারল, দু'পাশে সশব্দে আছড়ে পড়ল কপাট দুটো।

দু'জন নার্স আর একজন ডাক্তার ছুটে এল সঙ্গে-সঙ্গে। তাদের পাশ কাটিয়ে একটা বেডের উপর শুইয়ে দিল রানা রেবেকাকে। তারপর ফিরল পাশে দাঁড়ানো ডাক্তারের দিকে। চার পাঁচটা বাক্যের সাহায্যে যা বলার বলে পিছিয়ে এল রানা। ভয় হলো, জ্ঞান হারিয়ে ও রেবেকার বেডের উপর পড়ে যাবে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে ডাক্তারকে, রানার দিকে চেয়ে ইতস্তত করছে সে।

ওর আর কিছু করার নেই, অনুভব করছে রানা। যা করার ডাক্তার করবে এখন। এখন শুধু বুক ভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে ও। চোখ দুটো বুজে আসছে ।

চোখ বুজল রানা। একবার টলে উঠল শরীর। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করল। পারল না।

জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করল রানা একটা কেবিনে। সাদা একটা চাদর দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢাকা ওর। একজন নার্স ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের কাছে, কি যেন ওষুধ তৈরি করছে বলে মনে হলো। আরও ক'টা বেড রয়েছে কামরাটায়, কিন্তু আর কোন রোগী নেই কোথাও। রেবেকার কথা মনে পড়তেই বিছানার উপর উঠে বসল রানা। নিচে নেমে স্যান্ডেলটা খুঁজল এদিক ওদিক, দেখতে না পেয়ে মুখ তুলে তাকাল নার্সের দিকে, 'তুমি কিছু বলতে পারো...'

মাঝপথেই থেমে গেল রানা নার্সের বিমূঢ় দৃষ্টি লক্ষ করে। হন হন করে দরজার দিকে এগোল সে। রিস্টওয়াচ দেখে আঁৎকে উঠল মনে মনে। পৌনে একটা বাজে! প্রায় আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে হাসপাতালে আসার পর।

ছোট্ট একটা কেবিনে ঢোকার মুখে ডাক্তারের সাথে দেখা হলো রানার।

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওর আপাদমস্তক জরিপ করল ডাক্তার। 'শুনলাম অ্যাক্সিডেন্টালি আপনার স্ত্রীর শরীরে কোকেন ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে, কথাটা কি ঠিক?'

'ইয়েস, ডক্টর,' বলল রানা, 'কেমন আছে রেবেকা?'

'এখন ভাল,' ডাক্তার বলল। 'ফরেনার, তাই না?' আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত, 'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটলে আপনার স্ত্রীকে বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'অ্যাক্সিডেন্ট...'

'কিন্তু সাবধানে থাকাই ভাল নয় কি?' কঠিন সুরে বলল ডাক্তার. 'আপনার স্ত্রী এখন ঘুমাবেন। একবার দেখা করে এক্ষুণি ফিরে আসুন। তাঁর ঘুমের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটাবেন না। মৃত্যুর চৌকাঠ থেকে ফিরে এসেছেন উনি।'

কেবিনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা।

কাশমার হাত থেকে ফলের রস খাচ্ছে রেবেকা, রানাকে দেখে স্থির হয়ে গেল সে। ম্লান, ফ্যাকাসে মুখ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল।

কাশমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে রেবেকা বেড থেকে নামার জন্যে পা ঝুলিয়ে দিচ্ছে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোল রানা। ধরে ফেলল রেবেকাকে ও। 'কেমন আছ?'

'ভাল,' নিস্তেজ শোনাল রেবেকার কণ্ঠ।

কিছুক্ষণ কথা নেই কারও মুখে।

'কিন্তু, রানা!' রেবেকা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল রানার একটা হাত। দু'চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটল তার। 'আমি জানি, এবার তোমার ওপর আঘাত করতে চেষ্টা করবে ও।'

দু'পাশের চোয়াল উঁচু হয়ে উঠল রানার।

'এভাবে কতদিন চলতে পারে, রানা?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল রেবেকা, 'কতদিন!'

'আর নয়। শেষ দেখব এবার।'

রানার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখতে পেল রেবেকা।

দুই

'ভূমিকম্প?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। ব্রিটিশ চার্টে দ্বীপটার নাম লেখা আছে আর্থকোয়েক আইল্যান্ড। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে কায়ুদানা। আঠারোশো দুই সালে ভূমিকম্পটা হয়, দ্বীপের চার ভাগের এক ভাগ, সেই সঙ্গে দশ হাজার লোকজন নিয়ে সাগরে তলিয়ে যায়। অবশ্য ষোলোশো পঞ্চাশ সালে যে ভূমিকম্পটা

হয়েছিল তার তুলনায় ওটা নাকি ভূমিকম্পই নয়, খেরাকুন বাগমার মতে।'

'খেরাকুন বাগমা—'

সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমেছে অনেকক্ষণ হলো। ডাক্তারকে অনেক বলে কয়ে রানা রাত্রির মত শেষবার দেখা করতে এসেছে রেবেকার কেবিনে। ডাক্তার অবশ্য জানিয়েছে, আগামীকালই রেবেকা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে।

কফি চড়িয়েছে কাশমা ইলেকট্রিক স্টোভে। বেডের পাশে একটা টুলে বসে আছে রানা। রেবেকা শুয়ে শুয়ে রানার কথা শুনছে। অসুস্থতার কোন লক্ষণই নেই এখন ওর চোখেমুখে।

'খেরাকুন আসলে মুক্তো-ব্যবসায়ী,' বলল রানা, 'কায়ুদানায় তার বাড়ি, আমার সাথে জাকার্তায় পরিচয় হয়েছিল। ওর বাড়িতে গেছি দু'বার। তুমি যদি রাজি হও, কায়ুদানায় ওর বাড়িতেই উঠব আমরা। যদি মন গলাতে পারো, দুর্লভ দু'একটা মুক্তো সে তোমাকে উপহারও দিতে পারে!'

হেসে ফেলল রেবেকা, 'তাহলে তো যেতেই হয়। কিন্তু যাব কিভাবে?'

'বুদ্ধিমতীর মত প্রশ্ন করেছ,' বলল রানা, 'কোন প্লেন সার্ভিস নেই ওদিকে। হপ্তায় একটা জাহাজ যায়, কিন্তু তার জন্যে হয়তো দু'চার দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। দেখা যাক, কি করা যায়।'

পরদিন বালি সেন্ট্রাল হোটেলে উঠল ওরা।

সকাল বেলাই রানা বেরুল রেবেকাকে নিয়ে। টিকেট কিনবে জাহাজের। পথে চীনা মার্কেট পড়ায় ট্যাক্সি থামিয়ে কিম হোর দোকানে ঢুকল ও।

'টয়োমেনের চালান এসেছে, স্যার,' কিম বলল, 'কিন্তু সুলতান লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্ডারের মাল নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'তাই নাকি? কায়ুদানা থেকে লোক এসেছে?' আগ্রহ প্রকাশ পেল রানার কথায়, 'কোথায় সে? তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' কিম বলল। 'এই মার্কেটেই কেনাকাটা করছে, এখুনি ফিরবে। লঞ্চ নিয়ে এসেছে, আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে যাবে।'

ট্যাক্সি ছেড়ে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় বসল রানা। কফির অর্ডার দিল।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আসছি,' বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল ও।

রেস্তোরাঁ থেকে কিমের দোকানটা বেশ খানিকটা দূরে। দোকানে ঢোকার মুখে হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা ওর, রেবেকা রেস্তোরাঁয় একা—মনে পড়ে গেছে। উচিত হয়নি কাজটা। ফিরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসবে কিনা ভাবল একবার।

'এই যে স্যার,' দোকানের ভিতর থেকে কিম ডাকল ওকে, 'মহামান্য সুলতানের সেক্রেটারি সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

সাত মিনিট পর ঝড়ের বেগে রেস্তোরাঁয় ফিরল রানা। মাথা নিচু করে রেবেকাকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল ওর।

'চলো, রেবেকা,' বলল রানা। 'সুলতান বার্নো কাকাকুর লঞ্চেই আমরা কায়ুদানায় যাব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রেবেকা। 'আচ্ছা, রানা,' হঠাৎ প্রশ্ন করল সে, 'কায়ুদানায় যাওয়ার জন্যে এত আগ্রহ কেন তোমার?'

রানাকে একটু গম্ভীর হতে দেখল রেবেকা। ধীরে ধীরে বসল রানা চেয়ারে। জবাব দিল আরও কিছুক্ষণ পর। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ। 'আমার এক সময়ের সহকারী নিখোঁজ হয়েছে ওখান থেকে, রেবেকা। তার একটু খোঁজ করতে চাই আমি।'

'আর?' রানার দিকে তীব্র চোখে চেয়ে আছে রেবেকা। দু'ভুরুর মাঝখানে একটা রেখা ফুটল তার। 'আর কোন কারণ নেই?'

'আছে,' বলল রানা। 'মিত্রার কথা তো তোমাকে সব বলেছি। ও সম্ভবত কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে ওখানে...'

'উঁহুঁ,' রেবেকা ঘন ঘন মাথা নাড়ল, 'এসব না, এসব ছাড়াও অন্য কোন কারণ আছে। কি সেটা, রানা?'

চুপ করে রইল রানা। রেবেকা পরিষ্কার বুঝল, তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না রানা।

'দাতাকু যদি আমাদের অনুসরণ করে...'

রানা আরও গম্ভীর। উঠে দাঁড়াল ও ধীরে ধীরে। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চুপ করে গেল রেবেকা।

কায়ুদানায় যাওয়ার আসল কারণটা তাকে বলবে না রানা, ভেবে অভিমান হলো রেবেকার। কিন্তু সে-ও এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন না করে উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে।

'ভূমিকম্পের খবর আগাম পেয়ে চলে এসেছ, কেমন?' দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে এমন চাপ দিল যে থেরাকুনের বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে গত বছর তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না রানার। নিজেকে মুক্ত করে খোলা বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল ও। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে দেখল থেরাকুনের যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে রেবেকা, দূর সাগরের দিকে চেয়ে আছে সে।

মুচকি মুচকি হাসছে থেরাকুন, 'আমার মন বলছিল, বিশ্বাস করো, তুমি না এসেই পারো না।'

'কোন্ ভূমিকম্পের কথা বলছ তুমি, থেরাকুন?'

'ওহ হো!' থেরাকুন গলা ছেড়ে হাসল। 'তাই তো! ভূমিকম্প এখানে দু'রকমের রয়েছে, তা তো মনেই ছিল না। রানা, তুমি যে ধরনের ভূমিকম্পের মধ্যে নাক গলাতে পছন্দ করো আমি সেই ধরনের ভূমিকম্পের কথাই বলছি। কায়ুদানার ওই পারে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে, নিশ্চয়ই এই গুজব শুনেই এসেছ তুমি!'

'দূর-দূর!' বলল রানা, 'যাকে ইচ্ছা ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারো, সবাই সাক্ষ্য দেবে, এসপিওনাজের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে ফেলেছি আমি। থেরাকুন, বিলিভ মি, আমি এখন নিতান্তই সাধারণ একজন খামার-চাষী। খেত ধান, গম, যব, ভুট্টা আর আখ ফলাই, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ চরাই মাঠে, আর মদ তৈরি করে বিক্রি করি। পুরোদস্তুর চাষী বলতে যা বোঝায়, আমি তাই।'

'স্পাইগিরি তুমি ছাড়তে পারো না,' থেরাকুন মানতে রাজি নয়, এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে সে, 'তার আগে তুমি বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরবে। সে যাক, রফিকের কোন খবর পেয়েছ?'

'তোমার কাছ থেকে পাব খবর, এরকম একটা আশা ছিল আমার।'

'দুঃখিত, রানা,' বিষণ্ণ হলো থেরাকুন, 'কোন খবর জানি না। জানলে ইউনুসকেই বলতাম।'

'ভূমিকম্পের ব্যাপারটা কি, থেরাকুন?'

'কায়ুদানার ব্যাপার তো তুমি জানোই, রানা। দশ বছর আগে বর্তমান সুলতান দ্বীপটার ওই পারে বসবাস শুরু করার পর থেকে গোটা ইন্দোনেশিয়ার, বিশেষ করে জাভা আর বালির টেরোরিস্টরা ওখানে আস্তানা গেড়েছে। রেড ড্রাগনের নাম তো শুনেছ তুমি, তাই না?'

'রগনাম লার্তোর আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি—হ্যাঁ।'

'লার্তোর মৃত্যুর পর বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন সুলতান। বিদ্রোহীরা জমায়েত হয়েছে কায়ুদানায়।' বলল থেরাকুন, 'বিদেশী গুপ্তচরেরাও ভিড় জমিয়েছে এই সুযোগে। একজনকে তো খুব ভাল করেই চেনো তুমি।'

'মিত্রা সেন।'

'জানি!' সবজান্তার মত হাসতে লাগল থেরাকুন। 'নিছক বেড়াবার জন্যে বুড়ো থেরাকুনের কাছে তুমি আসতে পারো না। নিশ্চয়ই জবর কোন মতলব আছে।'

'রেড ড্রাগনের সঙ্গে মিত্রার কি সম্পর্ক, থেরাকুন? ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস সুলতানকে সাহায্য করছে নাকি?'

'কিছুই জানি না, রানা,' থেরাকুন বলল, 'বাতাসে খবর ওড়ে, তারই দু'একটা কানে আসে—ব্যস, ওই পর্যন্ত। এসব ব্যাপার যত কম জানা যায়

ততই ভাল—এটা তোমারই উপদেশ।'

'থেরাকুন,' বলল রানা, 'তোমাকে একটা কথা বলছি, কিন্তু যতটুকু বলব তার চেয়ে বেশি জানতে চেয়ো না।'

সকৌতুকে বলল থেরাকুন, 'দয়া করে যতটুকু দান করবেন তাতেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব, প্রভু! কিরে খেয়ে বলছি।'

'আমার ব্যক্তিগত শত্রু আছে একজন, থেরাকুন,' খানিক চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'তাকে আমি ইচ্ছা করেই এখানে নিয়ে এসেছি, কিন্তু সে তা জানে না। নিয়ে এসেছি মানে, ইতিমধ্যে সে পৌঁছেচে কিনা জানি না, তবে পৌঁছুবে। লোকটা ছায়ার মত অনুসরণ করছে আমাকে।'

'নাম কি?' ধমকের সুরে জানতে চাইল থেরাকুন, 'দেখতে কেমন? বালিনিজ, না জাভানিজ? এত বড় বুকের পাটা…'

'থেরাকুন! কোন প্রশ্ন নয়, বলিনি?'

'ঠিক আছে,' মুখ ব্যাজার করল থেরাকুন, 'ভুল হয়ে গেছে। বলো।'

'আর কিছু বলার নেই,' বলল রানা, 'একটা কথা শুধু জেনে রাখো, তোমার সাহায্য চাইতে হতে পারে আমার, নিজের জন্যে নয়, রেবেকার নিরাপত্তার জন্যে। তুমি…'

'সাহায্য! বলো কি করতে হবে?' থেরাকুন গম্ভীর। বুক টান করল সে, যেন তৈরি হয়েই আছে।

রানা হাসল, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, থেরাকুন। দরকার পড়লে জানাব তোমাকে।'

'একটা কথা,' থেরাকুন কি যেন ভাবল খানিক, 'রফিকের ব্যাপারে। আচ্ছা, ওর কি হাতের সবগুলো আঙুলই ছিল?'

'সবগুলো আঙুল! হাতের?' স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। 'হ্যাঁ, ছিল। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, থেরাকুন?'

'না, তেমন কিছু না, দু'জন জেলে সাগরে একটা পচা লাশ ভাসতে দেখে কিছুদিন আগে, লাশটার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ছিল না। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। রফিকের লাশ নয় তাহলে।'

থেরাকুনের স্ত্রী ললিতা রেবেকাকে নিয়ে ফিরে আসছে পাহাড়ের কিনারা থেকে।

পাহাড়ের একটা ঝুল-পাথরের উপর প্রচুর খরচ করে বাড়িটা তৈরি করেছে থেরাকুন। বাড়ির সামনে পঁচিশ গজের একটা সমতল উঠান। তারপর ঝপ করে নেমে গেছে খাড়া পাহাড়ের গা, নিচে সৈকত। সূর্য টকটকে লাল রঙ গায়ে মেখে নেমে যাচ্ছে দিগন্তরেখার দিকে, নীল সাগরের জলে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

খানিক উত্তরে গ্যানাঙ অ্যাপি, নয় হাজার ফিট আগ্নেয়গিরির চূড়া,

সেদিকে চোখ পড়তে কালো ধোঁয়ার মিনার দেখতে পেল রানা।

'এই সেই আগ্নেয়গিরি, তাই না? আমার ভয়ই করছে, রানা!' পাশে বসে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে চূড়ার দিকে তাকাল রেবেকা, 'মিসেস ললিতা বলছেন ওটার নিচেও নাকি লোক বসতি আছে! কি সাহস!'

'দুঃসাহসীদেরই ভিড় ওখানে আজকাল,' বলল খেরাকুন, 'টেরোরিস্টদের আস্তানা।'

'সুলতানও নাকি ওখানে থাকেন?' জানতে চাইল রেবেকা।

'হ্যাঁ,' খেরাকুন বলল। 'আগ্নেয়গিরির ওধারে যারা থাকে তারা এদিকের গ্রামগুলোয় কখনও আসে না। এককালে কায়ুদানার প্রাণকেন্দ্র ছিল ওধারটাই, এদিকে লোকজনই ছিল না। কিন্তু আঠারোশো দুইয়ের অগ্ন্যুৎপাত আর ভূমিকম্পে কায়ুদানা ধসে যায়, সাগরে তলিয়ে যায় প্রায় সবগুলো গ্রাম। মাত্র ত্রিশজন লোক ভাগ্য গুণে বেঁচে যায়। তারাই এদিকের এই গ্রামগুলোর গোড়াপত্তন করে। তারপর ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বেড়েছে—কিন্তু ওদিকে আজও কেউ ভয়ে যেতে পারে না। দু'একজন যারা গিয়েছিল তারা কেউ ফিরে আসেনি। বিদেহী আত্মাদের আস্তানা ওটা, স্থানীয় লোকেরা তাই মনে করে।'

'সুলতান তাহলে ওখানে কেন?'

'বছর দশেক আগে সুলতানের মাথায় খেয়াল চাপে তিনি প্রাচীন গ্রাম্য এলাকায় ফিরে যাবেন। বিরোধিতা কম করা হয়নি, কিন্তু কারও কথায় কান না দিয়ে কিছু লোকজনসহ ওখানে গিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করান, সেই থেকে ওখানেই আছেন তিনি। আসলে, রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। চরমপন্থীদের নিরাপদ আস্তানা বলতে সারা ইন্দোনেশিয়ায় ওই একটাই, সুলতান বার্নো কাকাকুর গ্রাম।'

'কিন্তু ভূমিকম্প হলে! যেভাবে ধোঁয়া উঠছে যেকোন মুহূর্তে…'

খেরাকুন হেসে বলল, 'না, ধোয়া বেরুতে দেখলে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা আমরা করি না। যখন কিছুই বেরোয় না, তখনই আমরা ঘাবড়ে যাই।' বাড়ির পরিচারক প্রৌঢ় কর্তার সাথে কাশমাকে আসতে দেখা গেল, দু'জনের হাতেই খাবারের ট্রে।

'শুনলাম বিদ্রোহীরা ওপারে জমায়েত হয়ে গোলমাল পাকাবার চেষ্টায় আছে,' রেবেকা বলল, 'জাকার্তা কি কোন খবরই রাখে না?'

'রাখবে কিভাবে? কেউ জানেই না কি ঘটছে ওখানে।'

রেবেকার মনোযোগ তখন সূর্যের দিকে। দিগন্তরেখা গ্রাস করছে মস্ত লাল থালাটাকে।

দেখতে দেখতে চারদিকে ছায়া পড়ল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দক্ষিণের গ্রামটার দিকে তাকাল রেবেকা। কাঠের ঘরগুলোর ভিতর থেকে নীলচে

ধোঁয়া বেরুচ্ছে, রান্নাবান্নার তোড়জোড় করছে গ্রামের মেয়েরা। ছোট ছেলেমেয়ের দল ছুটোছুটি করে খেলছে এখনও সৈকতে। ক্ষীণ হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।

কিছু একটা ভাবছে রানা। চেয়ে আছে গ্যানাঙ অ্যাপির দিকে। আগ্নেয়গিরির ভিতরের অগ্নিকুণ্ড বা শিখা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ধোঁয়ার গায়ে আগুনের আভা, দারুণ লালচে হয়ে উঠেছে বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

তিনদিনের দিন মিত্রা সেনের চিঠি পেল রানা।

উষ্ণ সাগরের পানিতে অবগাহন, থেরাকুনের দুই মাস্তুলওয়ালা নৌকোয় চড়ে মাছ শিকার আর সূর্যোদয়ের সময়টা দ্বীপের পাহাড়ে পাহাড়ে হেঁটে বেড়িয়ে প্রথম দুটো দিন কাটল। দ্বীপে দাতাকুর উপস্থিতির কোন চিহ্ন না দেখে রেবেকা যে মনে মনে খুশি হয়ে উঠছে তা বুঝতে পেরে রানা বরং একটু বিষণ্ন না হয়ে পারেনি। দাতাকু এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি দেবে এমন কথা ভাবাই যায় না।

তবে ওর মধ্যেও একটা নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। দাতাকুকে দ্বীপে দেখতে পাবে, ধরেই নিয়েছিল ও। কিন্তু তার ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ছে না কারও।

পিকনিক উপলক্ষে সুলতানের গুহা নামে পরিচিত একটা জায়গায় উঠল ওরা পরের দিন বিকেলে। থেরাকুনের বাড়ি থেকে মাত্র এক মাইল দূরে জায়গাটা। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে উঁচু নিচু পথ। পথে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা, সেটাই আকর্ষণ। দ্বীপটার চারভাগের তিনভাগই ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের খাড়া গা। কিনারা ঘেঁষে এগোবার সময় রেবেকার ভয় আর সাহস, দুটোরই প্রমাণ পাওয়া গেল। একবার একটা পাথর টপকাবার সময় কারও সাহায্যই নিতে রাজি হলো না সে। পাথরটা হাতখানেক উঁচু মাত্র, কিন্তু ওধারে পা ফেলার জায়গাটা হাত দুয়েক নিচুতে। রেবেকার ডান দিকে পাহাড়ের গা, বাঁ দিকে দেড় হাত দূরেই কিনারা, পাঁচশো ফিট নিচে বেলাভূমি। গায়ে কাউকে হাত দিতে না দিয়ে পাথরটার উপর বসল রেবেকা। পা ঝুলিয়ে দিল অপর দিকে। বাধাটা নিজের চেষ্টায় টপকে খিলখিল করে হাসতে লাগল সে। আরেকবার, কিনারা যেখানে পাঁচ হাত দূরে, কিন্তু পথটা অসম্ভব ঢালু বলে এক ইঞ্চিও আর সামনে বাড়তে রাজি হলো না সে। কারও সাহায্য নিয়েও না। একই কথা, দরকার নেই পিকনিক করে, ফিরে যাব এখান থেকে।

'ছিঃ, রেবেকা,' হাসি চেপে রাখল রানা, 'ওই দেখো, তোমার চেয়ে কত ছোট ওরা, কিন্তু কেমন সুন্দর নেমে যাচ্ছে! আর তুমি বলছ পারবে না?' পিঁপড়েগুলোকে দেখিয়ে বলল ও।

হেসে সবাই কুটিপাটি হলো।

'ঠিক আছে,' বলল রেবেকা। 'কোমরে দড়ি বেঁধে একটা প্রান্ত ধরে থাকো তুমি! এভাবে রাজি থাকলে, চেষ্টা করতে পারি আমি। আমার হাত

ধরে থাকবে আর আমি নামব, তা হবে না।'
'কেন?'
'পড়লে একাই পড়ব, তোমাকে নিয়ে পড়তে চাই না—আবার কেন!'
পথটা শেষ হয়েছে একটা পাথরের শেলফে। আকারে টেনিস কোর্টের মত, মেঝে থেকে ফ্যাকাসে ক্ষীণ ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে তাকাতে রানা দেখল, পাথরের মেঝেতে চিড় ধরা কাঁচের মত সরু সরু অসংখ্য ফাটল, সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। আগ্নেয়গিরির ওধারের সালফার লেকের সাথে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের মাধ্যমে এই পাহাড়ের একটা যোগাযোগ আছে, বোঝা গেল। পাহাড়ের নিচে তরল সালফারের স্তর রয়েছে, মেঝের ফাটল দিয়ে উঠে আসছে বাষ্প হয়ে।
উন্মুক্ত তাকের উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল রেবেকা। নিচে থেকে ফুট লাইটের মত সূর্য কিরণ পড়ছে ওদের গায়ে। রানার কাঁধে হাত রেখে তার উপর মাথার এক পাশ ঠেকাল রেবেকা। 'বাব্বা! এইটুকু পথ পেরোতে রক্ত পানি হয়ে গেছে আমার। এই রানা!' হঠাৎ চিৎকার জুড়ল ও, 'এর নিচে আগুন। দেখছ না ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'
'আগুন নয়, সালফার।' ব্যাখ্যা করল রানা।
নিখুঁত চারকোনা দরজা গুহাটার। মাথা নিচু করে নামতে গিয়ে রানা দেখল মেঝেটা হাত দেড়েক নিচে।
রেবেকাকে ধরে নামাল রানা। মাথায় প্রায় ঠেকে যায় ছাদটা। বাইরের তাকটার চেয়ে আকারে ছোট গুহার ভিতরটা।
'আরে! জানালাও আছে দেখছি একটা।'
গুহায় নামল থেরাকুন। 'সুলতানের জানালা ওটা। আঠারোশো দুই সালের ভূমিকম্পে সুলতান আর তার ছেলেও বেঁচে ছিলেন, রক্ষাপ্রাপ্ত সেই ত্রিশজনের মধ্যে। একটা বোটে চড়ে প্রাণ রক্ষা করেন তাঁরা। প্রচণ্ড ঢেউ বোটটাকে নিয়ে এসে ফেলে এখন যেখানে আমাদের গ্রাম সেখানে। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে সুলতানের ছেলে এই গুহাটা দেখতে পায়। এক বছরের বেশি ছিল তারা এই গুহায়। বৃদ্ধ সুলতান গ্রাম গড়ে ওঠার পরও এই জায়গা ছেড়ে নড়েননি। ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি, গ্রামের শোকে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল ওই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকা। হঠাৎ একদিন সাগরের তলা থেকে হারিয়ে যাওয়া গ্রামটা ভেসে উঠবে আবার—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। পরবর্তী সুলতানেরও এইরকম বিশ্বাস ছিল, ব্যতিক্রম শুধু বর্তমান সুলতান। অলৌকিক কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই তাঁর। তবে, প্রাচীন গ্রামগুলো যেখানে ছিল, আগ্নেয়গিরির ওই দিকটার ওপরে খুব টান তাঁর বরাবরই ছিল। বছর দশেক আগে তিনি তাঁর সাধ পূর্ণ করেন ওখানে গ্রামের পত্তন করে।'

থেরাকুনের সঙ্গীরা ব্যাগ আর প্যাকেট খুলে খাবারদাবার বের করে সাজিয়ে ফেলেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগরের আর মাত্র ইঞ্চিখানেক উপরে রয়েছে সূর্য।

একটা পাথরের উপর বসল থেরাকুন, রেবেকাকে চোখের ইশারায় দেখাল সামনের পাথরটা। সামনাসামনি বসল রানা আর রেবেকা। ললিতা প্লেটে খাবার পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত।

'গ্রামের বৃদ্ধ ওঝাই যত নষ্টের গোড়া,' থেরাকুনের গলায় ঝাঁজ, 'সেই এবার গুজবটা ছড়িয়েছে।'

'কি গুজব?'

চুরুট ধরাল রানা, তারপর থেরাকুনের চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিল।

'অমাবস্যার আগেই ভূমিকম্প হবে। সে নাকি স্বপ্ন দেখেছে তিনবার।' বলল থেরাকুন্, 'যত সব গাঁজাখুরি গল্প। আর গ্রামের লোকেরাও তেমনি। সবাই তার কথা বিশ্বাস করেছে। আজকাল কারও কোন কাজ নেই, আগ্নেয়গিরির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া। সবাই বলাবলি করছে, ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ হলো বলে। আগেই বলেছি, ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ হলে ধরে নিতে হবে, নির্ঘাত ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত!'

রানার একটা হাত ধরে ফেলল রেবেকা। রানা অনুভব করল, হাতটা কাঁপছে ওর। 'এ কোন্ জায়গায় নিয়ে এসেছ আমাকে!' রেবেকা অস্ফুটে বলল। 'রানা, আমার ভয় করছে!'

'দূর!'

ভরসা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, রেবেকা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'যাই বলো, রানা, কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে বিপদ ঘটবে। রানা, এখানে থাকব না আমরা। কবে নিয়ে যাবে আমাকে তুমি? আমি এক মুহূর্তও আর থাকতে চাই না এখানে।'

'পরশুদিন তো এমনিতেই চলে যাবার কথা আমাদের,' বলল রানা, 'মাঝখানে মাত্র একটা দিন।'

'না, কালকেই, কাল সকালেই...'

রানা বলল, 'কিন্তু স্টীমার সার্ভিসের সময়সূচী অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে পরশুদিনের আগে যাওয়া সম্ভব নয়, রেবেকা। তাছাড়া, ভয় পাওয়ার সত্যিই কিছু নেই। দেখছ না, ধোঁয়া উঠছে...'

'ওসব আমি শুনতে চাই না,' রেবেকা বলল, 'পরশুদিন বিদায় হতে চাই এখান থেকে, মনে থাকে যেন। কোন অজুহাত আমি শুনব না।'

রানার কেমন যেন বেখাপ্পা আর অস্বাভাবিক লাগল রেবেকার এই আচরণ, ভয় পেয়েছে খুব তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন জেদ কোন ব্যাপারেই তো আগে কখনও ধরেনি ও।

পরদিন সকালে মাছ ধরতে যাওয়ার তোড়জোড় চলছে, ললিতা এসে খবর দিল হিতাচি মাথরা নামে এক যুবক রানার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে।

হিতাচিকে দেখে হঠাৎ কেন যেন সতর্ক হয়ে উঠল রানা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা মোটেও পছন্দ হলো না ওর। চোখ দুটো আশ্চর্য চকচকে, ক্ষুরের মত ধারাল দৃষ্টি। কোমরের লেদার বেল্টের সাথে শান দেয়া একটা ভোজালি। কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের মাঝখান পর্যন্ত নেমেছে চুল। মাথার উপর লাল কাপড়ের পট্টি, কোমর পর্যন্ত ঝুলছে, শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে তাতে। নিঃশব্দে হস্তান্তর করল সে এনভেলাপটা।

এনভেলাপ ছিঁড়ে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বের করল রানা। হাতের লেখাটা চিনতে পারল সাথে সাথে। মিত্রা লিখেছে:

রানা,

আমি চাই তুমি এসো, আমার সাথে দেখা করো এবং আমাকে সাহায্য করো। এই চিঠি আমার তরফ থেকে সাহায্যের আবেদন বলে মনে করবে। তুমি আমাকে নিরাশ করবে না এ বিশ্বাস রাখি বলেই সাহায্য দাবি করছি।

ভালবাসা,
মিত্রা

'সুলতানের গ্রামে,' রানার চোখে চোখ রেখে হিতাচি মাথরা বলল, 'সবচেয়ে বড় পাতকুয়ার পাশে দুটো কমলা গাছ আছে। কুয়ার পিছনে সরু একটা প্যাসেজের মত দেখতে পাবেন, দু'পাশে উঁচু পাঁচিল। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা কাঠের দোতলা মই লাগানো আছে, সাদা রঙে রঙ করা। মইয়ের ওপর গার্ডদের সাথে কথা বললেই হবে।'

রানা মাথা নাড়তে পিঠের লাল কাপড় বাতাসে উড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল হিতাচি। বেলাভূমির দিকে ফিরে যাচ্ছে সে। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা। তারপর থেরাকুনের খোঁজে ঢুকল বাড়ির ভিতর।

পিছনের বারান্দায় পাওয়া গেল থেরাকুনকে।

'রফিক সম্পর্কে,' বলল রানা, 'তুমি জানতে চেয়েছিলে বাঁ হাতের সব আঙুল আছে কিনা, তাই না?'

বিমূঢ় দৃষ্টি ফুটল থেরাকুনের চোখে।

'ছিল,' বলল রানা, 'কিন্তু তাকে খুন করার পর তার কড়ে আঙুলটা কেটে নেয়া হয়। যে আঙটিটা পরত রফিক, এক মিনিট আগে মিত্রার পত্রবাহকের কড়ে আঙুলে দেখলাম সেটা। আর, এস, দুটো অক্ষর খোদাই করা রয়েছে ওতে।'

'তুমি লোকটাকে...'

'কিছুই করিনি বা বলিনি আমি,' বলল রানা, 'সময় বা স্থান উপযুক্ত নয়, তাই। কিন্তু, খেরাকুন, ব্যাপারটা যেভাবে আছে সেইভাবেই রেখে যেতে পারি না আমি। মনে মনে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ত্যাগ করেছি, কিন্তু অফিসিয়ালি এখনও আমি জড়িত। প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরব, তা সম্ভব নয়। তার মানে বুঝতেই পারছ, তোমার কাছ থেকে দরকার পড়লে যে সাহায্য চাইব বলেছিলাম, এখন তা চাইছি।'

'বলো কি করতে হবে আমাকে।'

'রেবেকা আর কাশমাকে তোমার দায়িত্বে রেখে যেতে চাই আমি,' রানা বলল।

'কোথায়?' খেরাকুন প্রশ্ন করল, 'সুলতানের গ্রামে?'

'হ্যাঁ!'

'রানা!' খেরাকুন রানার একটা হাত চেপে ধরল, 'আর যাই করো, জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ো না। সুলতানের গ্রামে ওরা যারা আছে, ওদের কাছে গিয়ে কেউ ফিরে আসতে পারেনি আজ পর্যন্ত।'

রানা মৃদু হাসল, 'তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছ। আমি কি আর ওদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি? যাব মিত্রার কাছে, ডেকে পাঠিয়েছে। কেউ জানবে না, ওখানে যাবার আর কোন উদ্দেশ্য আছে আমার।'

কিছুক্ষণ ভাবল খেরাকুন। পায়চারি শুরু করল। তারপর বলল, 'না, তোমাকে বাধা দেয়া উচিত নয় আমার। কারণ, তুমি কারও কথা শুনবে না। ঠিক আছে রানা, আমি ওদের যথাসাধ্য আগলে রাখব।'

কিন্তু রেবেকাকে অত সহজে রাজি করানো গেল না।

'গ্রামের সবাই ভয়ে কাঁপছে, ভূমিকম্প হবেই,' বলল সে, 'তোমাকে একা আমি যেতে দেব না।'

রফিকের ব্যাপারটা খুলে বলল না রানা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আভাস না দিয়েও কোন উপায় দেখল না। 'সম্ভবত এই আমার শেষ পেশাগত দায়িত্ব, রেবেকা। তুমি বাধা দিলে আমি যাব না, কিন্তু যেতে যদি না পারি, নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব চিরকালের জন্যে।'

দোটানায় পড়ে গেল রেবেকা। বলল, 'নিজের কাছে তুমি ছোট হয়ে থাকো তা আমি চাই না, রানা। ঠিক আছে, যাও, কিন্তু এই রকম আর যেন কখনও না হয়। কোন বিপদে একা তোমাকে আমি যেতে দেব না। ভুলে যেয়ো না, অনুষ্ঠানটা শুধু বাকি আছে, ওটা হয়ে গেলেই আমি তোমার স্ত্রীর মর্যাদা পেতে যাচ্ছি।'

'গলদা চিংড়ির দোপেঁয়াজা খাব রাতে,' রানা বলল, 'প্রচুর মাছ ধরা চাই কিন্তু! আজ রাতেই আমি ফিরে আসব।'

দশ মিনিট পর রানা দেখল দুই মাস্তুলওয়ালা নৌকায় চড়ে সাগরে ভাসল

রেবেকা, কাশমা, ললিতা আর থেরাকুন। ইনলেটের দক্ষিণ প্রান্তে হারিয়ে গেল নৌকা।

গ্রামে ফিরে এসে একজন বোটম্যানের সাথে কথা বলল রানা। সুলতানের গ্রামে পিছন দিক দিয়ে ঢুকতে চায় শুনে চোখ কপালে উঠে গেল বোটম্যানের। বক্তৃতার ভঙ্গিতে পথটা যে অগম্য তা বোঝানো শুরু করতেই রানা বাধা দিয়ে বলল, 'তাতে তোমার কি? তুমি আমাকে তীরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। কিভাবে যাব, পারব কিনা, সে আমার মাথা ব্যথা। ভেবে দেখো, ভাড়া তো পাবেই, বকশিশও পাবে ভাড়ার সমান।'

বোটম্যান বলল, 'ইনলেটের ওদিকে কোন বোট যায় না। রাজ্যের পাথর ওদিকটায়। ঠিক আছে, যেতে পারি, কিন্তু ভাড়া লাগবে দ্বিগুণ। বকশিশও...'

রাজি হলো রানা। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে, জানাল ওকে বোটম্যান। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে মোটর ধার করতে হবে তার, 'তেল কিনতে হবে, আনুষঙ্গিক কাজ আছে আরও।

পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে থেরাকুনের বাড়িতে উঠল রানা।

উপর থেকে বহু দূরে দেখা গেল মাস্তুল দুটোকে। থেরাকুনের নৌকা দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী ব্যবধান অতিক্রম করছে। থেরাকুনের বিনকিউলারটা বের করে নিয়ে এসে বসল রানা।

নৌকোর মাঝখানে দু'পাশে কাশমা আর ললিতাকে নিয়ে বসে আছে রেবেকা। সাদা ট্রাউজার পরা পা দুটো লম্বা করে মেলে দিয়েছে সে। উজ্জ্বল গোলাপী রঙের শার্ট গায়ে। কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তাকে ললিতা, দূর সাগরের দিকে উদাস ভঙ্গিতে চেয়ে কি যেন ভাবছে রেবেকা।

ছোট্ট একটা ব-দ্বীপ, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কতকগুলো পাম গাছ। গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকোটা। এখন শুধু বাতাসে ফুলে ওঠা সাদা পাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ওর বোটম্যান কতদূর কি করল দেখার জন্যে গ্রামের দিকে বিনকিউলার ঘোরাল রানা।

গ্রামের কোথাও লোকটার ছায়া পর্যন্ত নেই। বহু দূরের উঁচু ঘাসবনে কি যেন নড়ে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা। বিনকিউলার ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল ও।

দুটো মাথা। বোটম্যানের মাথার সাদা পট্টিটা পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। ঘাসবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে গোলাপী রঙের সারং। অন্য লোকটা কে?

ঘাসবনের ভিতর নাক পর্যন্ত আড়াল হয়ে রয়েছে লোকটার। মাথায় ছোট ছোট চুল। দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না কোঁকড়ানো কিনা।

কথা বলছে ওরা। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে বোটম্যান।

কাজ ফেলে গল্প করছে দেখে বিরক্ত বোধ করল রানা বোটম্যানের উপর।

বিনকিউলার ঘুরিয়ে তাকাল সাগরের দিকে। পাল বা নৌকো, কিছুই এখন দেখা যাচ্ছে না।

রেবেকার কথা ভাবতে শুরু করল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল উত্তাল সাগর। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে ট্রিস্টান ডা চানহার কাছ থেকে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে গলহার্ডির হোয়েল বোট, কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে জানা নেই। এমন সময় মাথার উপর উড়ে এল একটা হেলিকপ্টার। রেবেকার অদ্ভুত কৌশলে সে যাত্রা গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল ওরা। তারপর আরও একবার ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল রেবেকা, ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে যেতেই।

কি যেন দেখেও দেখছে না, মনে হলো হঠাৎ রানার। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ও।

রেবেকাকে 'কপ্টারের ককপিটে দেখে বিস্মিত হয়েছিল, মনে পড়ে গেল। আটলান্টিকের অতটা দক্ষিণে মেয়েরা সাধারণত যায় না বা তাদের নিয়ে যাওয়া হয় না। কালো লেদার হেলমেট আর ইন্টারকমের 'তারের জালে ঢাকা ছিল মুখটা। দেখা যাচ্ছিল শুধু চোখ দুটো। অপূর্ব!

সমুদ্রের রঙ লেগে রয়েছে চোখের সাদা অংশটায়, রেবেকার চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল রানার। কালো মণি দুটো যেন দু'ফোঁটা কফি। চোখ দুটোয় প্রতিচ্ছবি ফুটেছিল সমুদ্র আর ঝড়ের।

বরফের রাজ্যে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিল রেবেকা। রানাকে বলেছিল, 'বরফ আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, বরফ আমার কাছে জীবন্ত, হিংস্র প্রাণীর মত। ওর রাগ, হিংসা, আক্রোশ, নীচতা সব আমি বুঝতে পারি।···কিন্তু বরফ ছাড়াও অনেক কিছু থাকতে পারে···এতদিন কেন বুঝিনি—আশ্চর্য!'

রেবেকার সামনে নতুন একটা জীবনের দরজা খুলে দিয়েছে রানা। সমুদ্র ও বরফ থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসেছে ও, তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে এখন।

মনটা আবার খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। কি যেন দেখার আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না ও।

হঠাৎ বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে নিচের গ্রামের উপর দিয়ে দূর ঘাসবনের দিকে তাকাল ও। কায়ুদানার অপর অংশে যেতে হবে ওকে। প্রয়োজনটা জরুরী। বোটম্যানের তৈরি হতে কত দেরি আর?

আরে! বোটম্যান এখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে! অপর লোকটা···শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। এক সেকেন্ডের জন্যে লোকটার চিবুক পর্যন্ত মুখটা দেখল ও।

দাতাকু।

ঘাসবনের ভিতর ঘুরে দাঁড়িয়েছে দাতাকু। একটা হাত দেখতে পেল রানা। সাদা হ্যাটটা মাথায় পরে নিল। বেশিক্ষণ দেখা গেল না, উঁচু ঘাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল দাতাকু।

বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু অনুভব করল রানা।

স্বস্তি?

দেড় ঘণ্টা পর নেমে এল রানা গ্রামে। পাহাড়ের উপর থেকে যা দেখার দেখে নিয়েছে ও।

বোটম্যান আড়চোখে ওকে লক্ষ করছে দেখেও কিছু বলল না। দাতাকুকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে সে, যেখানে রানার পৌঁছুবার কথা। ইচ্ছা করলে সুলতানের গ্রামে সোজা পথ ধরে যেতে পারে ও, কিন্তু তা ওর উদ্দেশ্য নয়। দাতাকুর অ্যাম্বুশের মধ্যে পড়তে পারে, এ ভয় থাকলেও ঝুঁকিটা নেবে বলে অনেক আগে থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে ও।

খাঁ খাঁ উপকূল। তীর ঘেঁষে ছুটছে বোট। মাথা তুলে তাকাল রানা। সামনে একশো গজের মধ্যে আগ্নেয়গিরিটা।

কোথায় নামাবে ওকে বোটম্যান? ভাবছে রানা। দাতাকু কি ওকে তীরের নির্দিষ্ট কোন জায়গা দেখিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়নি?

দিয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।

কি করা উচিত? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। বোটম্যান যেখানে নামাবে সেখানেই কি নামবে ও?

কি ভেবেছে দাতাকু, কে জানে! ফাঁদে ফেলতে চায় রানাকে, তাছাড়া অন্য কিছু কি?

আধঘণ্টা পর বোটের নাক ঘুরল। তীরের দিকে এগোচ্ছে ওরা। একটা কাঁপুনি অনুভব করল রানা। ইতোমধ্যে ও ঠিক করে ফেলেছে, বোটম্যানকে কিছুই বলবে না। তাতে দাতাকুর মনে সন্দেহ জাগবে। সে যে তীরের কোথাও ওত্ পেতে বসে আছে রানার জন্যে, এতে ভুল নেই একটুকুও।

তীরের দিকে চোখ তুলল রানা। কিন্তু কোথায় তীর! প্রাচীরের মত বড় বড় পাথরের টুকরো—দূর থেকে দেখে রানার মনে হলো, বোট নিয়ে এগোনো সম্ভবই নয়।

কাছে যেতেই প্যাসেজগুলো দেখতে পেল রানা। পাথরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পাকা হাতে হুইল ঘুরিয়ে তীরের দিকে বোট নিয়ে যাচ্ছে বোটম্যান। 'গত দশ বছরে আর কেউ এদিকে আসতে সাহস পায়নি!' বলল সে।

'ভুল করলে,' বলল রানা। 'বছর দুই আগে এখানে শেষবার একজন বোটম্যান আমাকে নিয়ে এসেছিল, সে তোমার বাবা।'

কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বোটম্যান। 'তাই নাকি!'

মোটা টাকা খেয়েছে দাতাকুর কাছ থেকে, ভাবল রানা, চেপে ধরলেও স্বীকার করবে না দাতাকুর কথা।

তীর দেখা গেল একসময়।

বড় বড় অসংখ্য গহ্বর। ভিতরে গিয়ে ঢুকছে স্রোতের পানি, ভাঙা ঢেউ। ভিতরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তুমুল শব্দে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোটম্যানের চোখে। তীরের দিকে চেয়ে আছে সে। রানাকে নামিয়ে দেয়ার জায়গা খুঁজছে।

অপেক্ষাকৃত সমতল একটা জায়গা দেখতে পেয়ে সেদিকে নাক ঘোরাল বোটের। চিৎকার করে বলল, 'তীরে বোট লাগার আগেই লাফ দিয়ে পড়বেন, স্যার!'

তৈরি হয়েই ছিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বোটম্যানের দিকে তাকাল ও। ভাবল, কত টাকা ঘুষ দিয়েছে দাতাকু? তারপরই ছোট পাথরের নুড়ির উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাল সামলে নিল রানা। তীরের পাথরে ধাক্কা খাওয়ার আগেই বোটম্যান নিপুণ হাতে বোটের নাক ঘুরিয়ে ধনুকের মত একটা টার্ন নিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে হাত নাড়ল সে, চিৎকার করে বিদায় জানাল, 'সালামাত, তুয়ান!' অর্থ, যাত্রা তোমার শুভ হোক!

মুচকি হাসল রানা।

কোথাও কোথাও গোঁয়ারের মত ঘাড় বাঁকা করে পাথরের নুড়ির ভিতর থেকে উঁকি মারছে কাঁটা গাছের ঝোপ। ধীর ভঙ্গিতে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে রানা। দু'পাশে তাকাবার ইচ্ছাটা প্রতি মুহূর্তে দমন করছে ও। দাতাকু আশপাশেই কোথাও ওত্‌ পেতে আছে। এদিক ওদিক তাকালে দাতাকু ভাববে, তার উপস্থিতির খবর পেয়ে গেছে ও।

নুড়ি পাথর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় পাথরের রাজ্যে পৌঁছুল রানা। পথ চলা প্রায় অসম্ভব। চেয়ার টেবিলের মত সাইজ পাথরগুলোর, একটার উপর একটা বিদঘুটে ভঙ্গিতে পড়ে আছে। রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল রানা। একটা একটা করে টপকে পাঁচশো গজ এগোল ও, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে।

সন্দেহ হলো, দাতাকু এগিয়ে আছে ওর চেয়ে? পথচিহ্নহীন পাথরের রাজ্যে কোন্ দিক ধরে এগোবে ও তা কি সে আগে থেকে অনুমান করে রেখেছে?

দাতাকুর ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, ও তার ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়বে, ভাবছে রানা। তা যদি না হয়…

মাথার উপর হাতুড়ির বাড়ির মত পড়ছে কড়া রোদ। ট্রাউজার, শার্ট, গেঞ্জি বেয়ে দরদর বেগে ঘাম নামছে।

বাঁ দিকে একটা গুহা, জানে রানা, কিন্তু পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় সেদিকে ভুলেও তাকাল না। দাতাকু যে ওটার ভিতর নেই, জোর দিয়ে তা বলা যায় না। কিন্তু দাতাকু নিজের নিরাপত্তার কথা যদি ভাবে, গুহাটাকে ওত্ পাতার জায়গা হিসেবে বেছে নিতে পারে না সে। ওটা থেকে পিছু হটার কোন পথ নেই।

গুহাটা পিছনে ফেলে এগোবার সময় মাথার পিছনের চুলগুলো মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠল রানার। যে-কোন মুহূর্তে গুলির শব্দ শুনতে পাবে বলে আশঙ্কা করছে ও।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। ওয়ালথারটা হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করে দেখার ইচ্ছা হলো। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে দিল না নিজেকে।

আরও পঞ্চাশ গজ এগোবার পর রানা ধরে নিল দাতাকু যদি ফাঁদ পেতেও থাকে, তার সামনে দিয়ে আসেনি ও।

কোন সন্দেহ নেই, দাতাকু ওকে অনুসরণ করে আসছে। অনুসরণ যাতে করতে পারে, সেজন্যে সুযোগ করে দেয়া দরকার, ভাবল ও। সে যদি হারিয়ে ফেলে রানাকে, উদ্দেশ্য সফল হবে না তাহলে। অন্তত সময় দেয়া দরকার তাকে।

এত দূর থেকে সাগরের গর্জন এখন শোনা যাচ্ছে মৃদুতর। দূর থেকে শুধু অন্য একটা গমগমে শব্দ ভেসে আসছে, পাহাড়ের ওই দিকে লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাত থেকে। হাঁটু সমান উঁচু কাঁটা গাছের এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সড় সড় করে হেঁটে যাচ্ছে চকচকে সরীসৃপ, কোন কোনটা তিন হাত লম্বা।

ক্রমশ উপরে উঠতে উঠতে একহাজার ফিটেরও বেশি উপরে উঠে এসেছে রানা। যতটা দূর থেকে শব্দ শোনার জন্যে তৈরি ছিল ও, তার চেয়ে অনেক কাছে, একেবারে দশ গজের মধ্যে হঠাৎ পাথর পড়ার শব্দ হতে চমকে উঠে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা। দাতাকু ওর মাথার পিছন দিকে তাক করে ধরে আছে কোল্টটা,কল্পনা করে ঢোক গিলল ও। ঠাণ্ডা ঘাম এখন সড় সড় করে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। এক ঝটকায় পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে চরকির মত ঘুরে পিছন দিকে গুলি করার ব্যাকুলতাটা দমন করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ওর।

দাতাকু যে ওর ফাঁদ পর্যন্ত অনুসরণ করে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই, জানে রানা। খোলা জায়গায় ও থাকতে থাকতেই চোরা গুলি ছুঁড়ে লুকোচুরি খেলাটা সাঙ্গ করে দিতে পারে সে। যদি চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

ঘন ঝোপটা দূর থেকে দেখতে পেল রানা। হাতের তালু ঘামছে, টের পেল ও। নার্ভাস ফীল করল হঠাৎ। ঝোপটার ওপাশেই লুকিয়ে আছে কার্নিসটা, যেটা সোজা চলে গেছে জলপ্রপাত পর্যন্ত। দাতাকু কি আসবে পিছু

পিছু? নাকি ওর উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে গুলি করার কথা ভাবছে···?

কিন্তু দাতাকু যে অনুসরণ করছে তার প্রমাণ কি? এতক্ষণ তেমন কোন শব্দ পায়নি ও যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়।

হঠাৎ পিছনে টান অনুভব করল রানা। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। চোখের পলকে পকেট থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালথারটা। ঘুরে তাকিয়েছে সেইসাথে। সাদা হ্যাটটা আধ সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেল ও। এই ছিল, এই নেই! পাথরের আড়ালে সেটা এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ঝোপের কাঁটা থেকে শার্টটা মুক্ত করে নিল রানা। গতি মন্থর করল।

এটাই শেষ এলাকা, যেখানে দাতাকু ওকে হারিয়ে ফেলতে পারে। ডান দিকে নয়, বাঁ দিকে টেনে আনতে হবে তাকে। বাঁ দিকে কার্নিসটা ক্রমশ অপ্রশস্ত হতে হতে ত্রিশ ইঞ্চিতে গিয়ে ঠেকেছে। ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া কার্নিসটার পরই ফাঁদটা। লাফটা যদি না দেয় দাতাকু, কপাল ভাল মনে করতে হবে তার। অর্থাৎ, বেঁচে যাবে সে।

কিন্তু ঝোপের বাইরে বেরিয়ে ওকে কার্নিসের দিকে এগোতে দেখে দাতাকু কি করবে, বলা মুশকিল। অনুসরণ করবে কি করবে না ভাবতে হবে তাকে, কোন সন্দেহ নেই। যদি ভাবে অনুসরণের ঝামেলা আর বাড়িয়ে লাভ কি, তাহলে গুলি করতে দেরি করবে না সে।

প্রকাণ্ড একটা ঝুল-পাথরের মিনারের ছায়া থেকে বেরিয়ে কার্নিসের চওড়া চত্বরে এসে দাঁড়াল রানা। দাতাকুর গুলি করার আরেকটা সম্ভাবনা আবিষ্কার করল ও সেই মুহূর্তে।

উচ্চতাকে যদি ভয় পায় দাতাকু, কার্নিসের উপর দিয়ে এগোতে পারবে না সে বিশ গজের বেশি। বিশ গজ এগোবার পর পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটতে হবে, কেননা মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া ওখানে কার্নিসটা। একপাশে পাহাড়ের গা, আরেক পাশে অসীম শূন্যতা। ঘাড় ফেরালেই সাগর, দেড় হাজার ফিট নিচে।

অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করছে রানা।

ধীর পায়ে সামনে এগোচ্ছে ও। শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি এখন সজাগ।

প্রতিটি সেকেন্ড অনুভব করছে রানা, ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডগুলো। কিছুই ঘটল না।

বেঁকে গেছে ডানদিকে কার্নিসটা। পাথরের একটা পাঁজর আড়াল করে রেখেছে সামনের পথ। ওটা দ্রুত পেরিয়ে গা ঢাকা দেয়ার একটা ইচ্ছা জাগল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করাটা বোকামি হয়ে যাবে ভেবে থামিয়ে রাখল নিজেকে।

পাহাড়ের পাঁজরটার এপারে চলে এল রানা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়ল। পরমুহূর্তে নিজের বোকামিতে হাসল রানা আপন

মনে। বিপদ কেটে গেছে বলে ভাবছিল ও, আসলে মাত্র শুরু হয়েছে। গুলি করার আরও অনেক সুযোগ পাবে দাতাকু। সতর্কও সে ভীষণ, যখনই টের পাবে রানার মনে কোন উদ্দেশ্য আছে, একমুহূর্ত দেরি না করে গুলি করবে।

কিন্তু এখনও কি সে অনুসরণ করছে?

জানার কোন উপায় নেই। আপাতত।

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন জলপ্রপাতের শব্দ। ঠিক দেড় হাজার ফিট উপরের ঝর্ণা থেকে সোজা, কোথাও বাধা না পেয়ে সাগরে নামছে সালফার মেশানো হলদেটে, উষ্ণ কয়েকটা পানির ধারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

আগ্নেয় চূড়াটার ঠিক নিচে এসে দাঁড়াল রানা। হাঁপিয়ে গেছে।

লক্ষ করল, আগ্নেয়গিরির চূড়া থেকে লাভার স্রোত পাহাড়ের এদিকটায় গড়িয়ে পড়েনি। কার্নিসটা তাই আছে আজও। ক্যাম্বিসের জুতো ভেদ করে গরম পাথরের উত্তাপ লাগছে রানার পায়ে।

পায়ের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি ছিটকে নিচে পড়ল রানার। ছয় ইঞ্চি পাশেই কিনারা। সোজা নিচে দেখা যাচ্ছে সৈকত, নীল পানির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মত ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনরাশি।

রানার পিঠে ছুরি দিয়ে আঁচড় কাটল যেন কেউ, পেশীগুলো কেঁপে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে। স্থির হয়ে গেল পা দুটো নিজের অজান্তেই। দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল পাহাড়ের গা। পড়ে যাচ্ছে যেন, মনে হচ্ছে ওর। সাগরের দিকে পিছন ফিরল ও। চোখ দুটো বুজে গেছে। অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করেছে পা।

এসব একটা রোগের উপসর্গ। অবাক লাগছে রানার। কোনদিন ভাবেনি, অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হবে সে। এর চেয়ে অনেক উঁচু থেকে নিচের দিকে তাকিয়েছে ও, পড়ে যাবার অদম্য ভয় কখনও ওকে কাবু করতে পারেনি।

দাতাকু আসছে, ভাবল রানা। উটকো ভয়টাকে তাড়াবার জন্যে দাতাকুর কথা ভাবতে শুরু করল ও। কতখানি পিছনে সে এখন? ওকে দেখতে পাচ্ছে?

মাথা তুলে ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। তিন ইঞ্চি সামনে পাহাড়ের গা। সামনে তাকাল মাথা ঘুরিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে একটা হাত রেখে ডান পা তুলে আধ হাত সামনে ফেলল রানা। তারপর বাঁ পা তুলল।

দাতাকু কি সত্যিই আসছে?

বোঝার কোন উপায় নেই। দু'জনে হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এগোচ্ছে।

নিঃশেষ হয়ে এসেছে সামনে কার্নিসটা। শেষ ভাগটা আগের চেয়ে অনেক খাড়া। সাবধানে এগোচ্ছে রানা। পায়ের দিকে তাকাচ্ছে না,

তাকালেই চোখ পড়বে নিচের দিকে।

পা বাড়িয়ে কার্নিসটা অনুভব করে নিচ্ছে রানা প্রতিবার। যেখানে পা ফেলবে সে জায়গাটা আলগা কোন পাথরের অংশ কিনা বুঝে নিতে চাইছে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে, চাপ দিয়ে। ওর ভার সহ্য করতে পারবে মনে হওয়ার পরই শুধু পা ফেলছে সেখানে।

ক্রমশ চিকণ হয়ে গেছে কার্নিসটা। এখানটায় মাত্র তিন ইঞ্চি চওড়া। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

পাথরের খাঁজে হাত ঢুকিয়ে তাল সামলাতে হচ্ছে এখন। দাঁড়িয়ে আছে, তবু মনে হচ্ছে: ও যেন ঝুলছে।

জুলফি থেকে ঘামের ধারা নামতেই মাথাটা ঝাঁকাল ও। পাথরের সাথে ঠুকে গেল কপাল। খাঁজ থেকে বেরিয়ে এল হাত। মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। খাঁজের কিনারায় আবার আটকে গেল আঙুলগুলো।

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ও। ফাঁদটার প্রবেশ পথ এখন ওর সামনে।

হাঁপাচ্ছে রানা।

পেশী টানটান হয়ে উঠেছে, লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি এখন রানা। লাফ দিয়ে যেখানে নামবে সে-জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না। কার্নিসের মসৃণ ঠোঁট থেকে মাত্র নয় ফিট নিচে জায়গাটা। রানার পায়ের কাছ থেকে দেড় হাত নিচে টিউমারের মত ফুলে আছে পাথর। ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে, তারপর বাঁক নিয়ে মিশে গেছে আবার পাহাড়ের গায়ের সাথে।

সামনের দিকে লাফ দিতেই পাহাড়ের আড়াল থেকে শূন্যে বেরিয়ে এল রানা। মনে হলো নিচের বনভূমি, গ্রাম, ঢিবি, আর সাগর খানিকটা উঠে এল উপর দিকে।

যেখানে নামল, জায়গাটা সমতল। একশো গজ লম্বা, চওড়ায় পঞ্চাশ গজের বেশি হবে না। নুড়ি পাথর আর কাঁটা গাছের ঝোপে ভর্তি। এক পাশে পাহাড়ের প্রাচীর, অন্য পাশে কিছু নেই—নিচে সাগর। রানার পিছনে পাহাড়ের ব্যাধি, টিউমার। তার উপর চিকণ কার্নিসটা, যেখানে ফিরে যাওয়া আর কোনভাবেই সম্ভব নয়।

সামনে মস্ত পাহাড়ের প্রাচীর।

ফাঁদ।

তিন

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দাতাকুকে দেখা যাচ্ছে না।

হাঁটু সমান ঝোপের কোঁকড়ানো খয়েরী রঙের পাতা পাথরের উপর পাঁপড় ভাজার মত হয়ে আছে, পায়ের চাপে মুড় মুড় করে ভাঙছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল রানা। কি যেন খুঁজছে ও।

হাত দশেক সামনে, খানিকটা বাঁ দিক ঘেঁষে তেকোণা চুলোটাকে দেখতে পেল। নিজের তৈরি চুলোটা চিনতে পেরে অকারণ খুশি লাগল রানার! কী আশ্চর্য, পাশে জমা করা শুকনো পাতার স্তূপটা এখনও ঠিক তেমনি আছে! দু'বছর পরও! এই ফাঁদে পড়েছিল সে ঠিক দু'বছর আগে।

আবার পিছন ফিরল রানা। দাতাকুর ছায়া পর্যন্ত নেই কার্নিসে। পিছিয়ে গেছে? ওর কোন মতলব আছে ভেবে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু···না, অসম্ভব! ওর কোন মতলব আছে তা দাতাকুর জানার কথা নয়। সে জানে, ওর অজ্ঞাতে ওকে অনুসরণ করছে সে।

তবু, ভাবল রানা, ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত। দাতাকু ফাঁদে নামতেও পারে, নাও পারে।

সামনের ঝোপগুলো মাথা সমান উঁচু। ভিতরে ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দাঁড়িয়ে রইল।

সিগারেট বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে কি মনে করে ক্ষান্ত হলো সে। উঁচু কার্নিসের দিকে চোখ। আকাশের গায়ে কখন দেখা যাবে দাতাকুকে, তারই অপেক্ষা এখন। কার্নিসের শেষ সীমা পর্যন্ত যদি আসে সে, নামতে হবে তাকে নিচে। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পথের শেষ মাথায় কোনরকমে যদি পৌঁছায়, সেই পথেই ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শিউরে উঠবে যে-কেউ। তারচেয়ে লাফ দিয়ে এই ফাঁদে পড়া নিরাপদ বলে মনে হবে তার। এটা ফাঁদ তা তো সে আর জানে না।

ওর ভয়ে না হলেও, উচ্চতার ভয়ে পিছিয়ে যায়নি তো সে? কথাটা ভাবতে নিরাশায় ছেয়ে গেল মন। কে জানে, উপর থেকে নিচের দিকে তাকাতেই পারে না হয়তো দাতাকু। কার্নিসটা ক্রমশ চিকণ হয়ে গেছে দেখে সে হয়তো···

প্রকাণ্ড কালো একটা ছায়া দেখল রানা। এক নিমেষে ঢেকে ফেলল ওকে। ঝট্ করে মুখ তুলল। তাকাতে দেখল আকাশের গায়ে বিরাট একটা

ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়েছে। ভেসে যাচ্ছে বাতাসে, তারই ছায়া। গ্রামবাসীদের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটছে, কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা। ধোঁয়া বেরুতে দেখলে ভূমিকম্প হওয়ার কোন ভয় নেই।

চারদিকে তাকাল। এই জায়গার প্রতিটি ইঞ্চির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ওর। তিনদিন আটকা পড়ে ছিল ও এখানে। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই, এক ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল ও। তখনকার সেই আতঙ্ক, জীবনে কখনও ভুলবে না রানা।

ওই আসছে!

আকাশের গায়ে কেউ যেন সেঁটে দিয়েছে দাতাকুকে। রোদ লেগে চকচক করছে ঘামে ভেজা বাদামী মুখটা। চওড়া বুকটা উঠছে আর নামছে। অসম্ভব হাঁপাচ্ছে দাতাকু।

পিছন ফিরতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। একচুল এদিক ওদিক হলেই তিন ইঞ্চি চওড়া কার্নিস থেকে পা হড়কে পড়ে যাবে।

ঝোপ আর পাথরভর্তি নিচের সমতল জায়গাটার দিকে চেয়ে আছে দাতাকু। আরও একবার পিছন ফিরতে গিয়ে সামলে নিল। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

এতক্ষণে হয়তো দাতাকু ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে। কিন্তু ঝুঁকিটা যে নেবে, সে সাহস নেই তার এখন।

ভুল হয়ে যাচ্ছে কথাটা মনে হতেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। হাঁটতে শুরু করে হাত দুটো একটু দোলাল। দাতাকুর চোখে পড়তে চায় ও। ওকে দেখতে পেলে খানিকটা সাহস ফিরে পাবে সে। নিচে নামবে নিঃসংশয়ে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল রানা। খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপরই পাহাড়ের ছুঁচাল একটা পাঁজর। সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও। বাঁক নিতেই মুখে উষ্ণ হলুদ পানি পড়ল। আপনা থেকেই বুজে গেল চোখ।

শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে নিল রানা। মাথার উপর জলপ্রপাত শুরু হলো। এগোতে শুরু করল আবার।

হাঁটার গতি আপনা থেকে শ্লথ হয়ে আসছে।

রানা! সাবধান! কানের কাছে ফিসফিস করছে বাতাস।

শুরুতেই এই কার্নিসটা ছয় ইঞ্চি। গজ তিনেক উঁচু হয়ে গেছে সামনের দিকে। তারপর পাহাড়ের একটা পাঁজর। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, সূক্ষ্ম স্তর দিয়ে ঘেরা পাথর এদিকে। পাঁজরের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে কার্নিসটা।

ঢোক গিলল রানা। পাথরের গায়ে কোন গর্ত না পেয়ে ডান পা-টা ইঞ্চি ছয়েক বাড়াল। পাহাড়ের গায়ে শরীর চেপে এগোল খানিকটা। হাত দিয়ে হাতড়ে একটা খাঁজের কিনারা অনুভব করল আঙুলের মাথায়।

আরও ক'ইঞ্চি এগোতে হবে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। ঢোক

গিলতেও গলাটা ভিজল না। পা তুলে সামনে ফেলছে রানা। তাকাল নিচের দিকে।

আবার সেই পিঠে ছুরির আঁচড় কাটল যেন কেউ। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। পড়ে যাচ্ছে রানা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও সৈকত, সাগর। দুলছে চোখের সামনে। সৈকত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, উপর দিকে উঠে আসছে বিশাল সাগর।

মাথা ঘুরছে রানার।

দুঃস্বপ্নের মত লাগছে সবকিছু। নিচের জগৎটা আলোড়িত হচ্ছে মন্থর গতিতে। ছিটকে পড়ে যাচ্ছে ও, হঠাৎ মনে হতেই আঁতকে উঠল। ঠিক সেই সময় খাঁজের কিনারা ধরে থাকা আঙুলের গায়ে শীতল একটা স্পর্শ পেল ও।

সময় জানা নেই রানার। কত যুগ লাগল, নাকি এক নিমেষে মুখ তুলে তাকাল, বুঝতে পারল না।

প্রথমে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেল না সে। ঝাপসা লাগছে সব। পাথরের প্রাচীরের উপর কি যেন নড়ছে। নাকি চোখের ভুল?

চোখেরই ভুল। ভাবছে রানা। পাথরের গায়ে হলদেটে ফোঁটা আঁকা একটা লম্বা দাগ—তাই হবে।

হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেল দৃষ্টি। দেখতে পেল রানা। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ ওর। সড় সড় করে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে লেজটা। হলুদ আর কালো রঙের বুটি সারা গায়ে। পাহাড়ী গোখরা।

ঝুলে রয়েছে রানা। চোখ দুটো বিস্ফারিত। এক চুল নড়তে পারছে না এদিক ওদিক।

কপালে নেমে আসা চুলের ফাঁক দিয়ে সম্মোহিতের মত সাপটাকে দেখছে রানা। স্তব্ধ হয়ে গেছে বাতাস।

আঙুলের মাংসে গর্তের ধারাল কিনারা গেঁথে বসছে। হাতটা কেঁপে উঠল রানার। সাপটা অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে। লেজ বাঁকা করল। টের পেয়েছে সে রানার আঙুলের উপস্থিতি। ঘাড় বাঁকা করে মুখটা গর্তের বাইরে বের করতে চাইছে।

বাঁকা লেজটা শূন্যে খাড়া হয়ে গেল। আতঙ্কের ঘোরটা কাটিয়ে উঠল রানা। গর্তের কিনারা থেকে টেনে নিল আঙুল দুটো। বিদ্যুৎ গতিতে ধরল সাপের লেজটা, টান মেরে ছেড়ে দিয়েই হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল আবার গর্তের দিকে।

পাথরের উপর বাড়ি খেল হাতটা বেশ জোরে। গর্তের ভিতর সেঁধিয়ে গেল তিনটে আঙুল। নিজের অজান্তেই ঘাড় বাঁকা করে নিচের দিকে তাকাল রানা।

অনেক নিচে বেলাভূমি। চিক চিক করছে রোদ লেগে। পোড়া একটা

দেশলাইয়ের কাঠির মত সাপটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা।

তলপেটের ভিতরটা মোচড় দিতে শুরু করতেই মাথা তুলে অন্যদিকে তাকাল রানা। হাঁপাচ্ছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা মানে অ্যাক্রোফোবিয়াকে সুযোগ করে দেয়া। চোখ বুজে ফেলল রানা। পাহাড়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে স্থির করল শরীরটা। একটা পা তুলে ফিতে খুলে ফেলল জুতোর।

জুতো দুটো গলায় ঝুলিয়ে নিল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের প্রথম পাঁজরটার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই দেখল দু'হাত পাখনার মত মেলে দিয়ে বাদুড়ের মত লাফ দিচ্ছে দাতাকু।

অর্থাৎ ফাঁদে আটকা পড়েছে।

হন হন করে এগিয়ে আসছে সে। সোজা ঝোপের দিকে। রানার উঁকি মারাটা চোখে পড়েছে হয়তো তার। এখন আর কিছু যায় আসে না, ভাবল রানা।

তাড়া অনুভব করল ও। বেরিয়ে যেতে হবে ফাঁদটা থেকে। দ্রুত।

পাঁজরের পাশ ঘেঁষে সাবধানে এগোল ও। হাঁটার কোন উপায় নেই। একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া শুধু। কার্নিস এখানে তিন ইঞ্চি চওড়া। ছোট হতে হতে আড়াই, দুই, দেড়, এক, আধ, সিকি ইঞ্চি, তারপর ভিজে পাথরের গায়ে বেমালুম মিলিয়ে গেছ। সামনে কালো, উষ্ণ পাহাড়ের চকচকে মসৃণ গা। খাঁজহীন, গর্তহীন। সোয়া হাত পরেই বাঁকটা।

আশ্চর্য তীক্ষ্ণ এক বাঁক। এদিক থেকে ওদিকের এক চুল পরিমাণ দেখার উপায় নেই।

কার্নিসের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছুল রানা।

কার্নিস এখানে দেড় কি সোয়া এক ইঞ্চির মত। তার উপর ডান পায়ের আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে আছে ও। বাঁ পা-টা ডান পায়ের উপর আলতোভাবে তোলা। নাক ঠেকে আছে পাথরে। ওর পিঠ থেকে গজ তিনেক দূরে উষ্ণ জলপ্রপাতের ধারা। সালফারের ঝাঁঝাল গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে।

ধীরে ধীরে হাত দুটো তুলছে। শরীরের আর কোন অংশ নড়ে উঠলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে ও।

কানের পাশে একটানা জলপ্রপাতের শব্দ। শুধু অনুভব করছে, সড় সড় করে নামছে ঘামের কয়েকটা ধারা জুলফি আর কপালের পাশ ঘেঁষে নিচের দিকে।

দু'হাত তুলে পাহাড়কে আলিঙ্গন করল রানা।

সোয়া হাত দূরে বাঁকটা। বাঁ হাত বাড়িয়ে বাঁকা করে দিল ও। হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওদিকে।

দেখতে পাচ্ছে না রানা, পাহাড়ের ওধারে ওর হাতের আঙুলগুলো

কিলবিল করছে। কি যেন খুঁজছে।

পাথরের গায়ে দুটো আঙুল ঢোকার মত ছোট্ট একটা গর্ত, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা মনের চোখ দিয়ে। খুঁজছে আঙুলগুলো। কিন্তু কোথায়! নেই কেন?

হঠাৎ খেয়াল হলো, গর্তটা বোধহয় আরও একটু উপরে।

এক, দুই করে সেকেন্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। তবে কি নেই? বিশ সেকেন্ড পর আঙুলে ঠেকল গর্তটা। কিন্তু…কেঁপে উঠল রানা। আকারটা এত ছোট, মনেই ছিল না ওর। স্মৃতি ওকে ঠকিয়েছে।

নাকি এটা অন্য কোন গর্ত?

আরও বিশ সেকেন্ড এদিক ওদিক আঙুল চালাল রানা। আর কোন গর্ত নেই। তার মানে ওটাই।

পাথরের গায়ে আঙুল চালাল আবার রানা। একবার উপর, তারপর নিচে। গেল কোথায়?

দাঁতে দাঁত পিষে ধরেছে রানা। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও।

নিচের দিকে তাকাল একবার। দুলে উঠল গোটা দুনিয়া।

গর্তটায় আঙুল ঢুকে গেছে একটা, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড তা জানতেই পারল না ও। হঠাৎ শরীরটা কাত হয়ে গেল। পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে শরীরের ভার গিয়ে পড়ছে হাতের আঙুলটার উপর।

তখনও পড়ে যায়নি দেখে সচেতনতা ফিরে পেল রানা। অনুভব করল সেই সাথে, গর্তটা আবার খুঁজে পেয়েছে ও।

আরেকটা আঙুল গর্তের ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করছে রানা। কিন্তু জায়গা হচ্ছে না।

তীব্র জ্বালা অনুভব করে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। আঙুলটার চামড়া ছিঁড়ে গেছে। সালফার মেশানো পানি রক্তের সংস্পর্শে আসতেই গোটা শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

একটু আশা দেখতে পেল রানা। গর্তের ভিতর দুটো আঙুলই ঢুকেছে। এবার পায়ের জন্যে একটা গর্ত চাই।

মুখটা ধীরে ধীরে ঘোরাল সে। ডান চোয়াল ঠেকাল ভিজে পাথরের গায়ে। বাঁ পা তুলল ডান পায়ের উপর থেকে। প্রাচীরের গায়ের সাথে সেঁটে একটু একটু করে বাড়িয়ে দিচ্ছে সেটা। মরিয়া হয়ে পাহাড়ের সাথে চেপে রেখেছে বুক, পেট, ঊরু ও হাঁটু।

ধীরে ধীরে শরীরের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে রানা বাঁ হাতের আঙুল দুটোর উপর।

রানা জানে, খাড়া প্রাচীরটা তির্যক ভাবে উঠে গেছে। কিন্তু তবু এটা যে প্রকাণ্ড একটা ঝুল পাথর নয়, এই ভ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না

ও। চুম্বকের মত একটা শক্তি ওর শিরদাঁড়া ধরে টান দিচ্ছে অনবরত। গোটা পাহাড় যেন কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর গায়ের উপর।

চোখের কোণে নরম শ্যাওলা লেগে কর কর করে উঠল। কয়েক চুল পরিমাণ নাড়ল রানা মাথাটা। একচুল একচুল করে মুখটা সরাচ্ছে ও। সামনে এগোচ্ছে সেটা। দু'চোখে মরিয়া দৃষ্টি, পাতা দুটো বিস্ফারিত। ঠিক সামনেই কুচকুচে কালো পাথর। তারপরই হলদেটে জলপ্রপাতের পানির শেষ কয়েকটা ধারা। সেগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গভীর নীল রঙের বিশাল আকাশের একটা ফালি।

হঠাৎ করেই যেন মুখটা কোণায় পৌঁছে গেল। চোখের সামনে থেকে কেউ যেন এক নিমেষে সরিয়ে নিল কালো একটা পর্দা। বিশাল আকাশ, বিস্তৃত ভূমি আর অথৈ সাগর—গোটা দৃশ্যটা ঝলসে উঠল চোখের সামনে।

গরম পেরেক গেঁথে দিল কেউ যেন ওর পিঠে।

চোখ বুজে ফেলল রানা। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। গভীর তলদেশ থেকে উঠে এসেছে যেন অদৃশ্য এক শত্রু, দু'হাতের হাজারটা ধারাল নখের আঙুল ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ওকে পিছন থেকে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে টানছে। পাহাড়ের গা থেকে খসিয়ে শূন্যে ছেড়ে দিতে চাইছে।

বিদ্যুৎ চমকের মত মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ল দাতাকুর কথা। ওর পিছনেই রয়েছে সে। সম্ভবত পিস্তল তুলে লক্ষ্যস্থির করছে।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দু'দিক থেকেই। অলৌকিক কিছু না ঘটলে—মৃত্যু। অবধারিত।

বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। সহ্য-সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে স্নায়ু। শরীরের সমস্ত পেশী বিদ্রোহ করতে চাইছে। পাহাড়ের ওদিকে ওর বাঁ পা, গোড়ালি দিয়ে পাথরের গায়ে খুঁজছে গভীর, নিরাপদ গর্তটা। যে গর্তটা দু'বছর আগে ঠিক এইভাবে, শেষ মুহূর্তে, আবিষ্কার করেছিল ওর পায়ের গোড়ালি।

গর্তটা নেই!

হঠাৎ ভূমিকম্প দ্বীপের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে গেল রানার। প্রতি বছরই কয়েকবার করে লাভা উদিগরণ করে থাকে আগ্নেয়গিরিটা। ছোটখাট ভূমিকম্প হয় কয়েকবার করে। দু'বছরের মধ্যে পাথর এক বা দু'ইঞ্চি এদিক ওদিক নড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

গর্তটা হয়তো আছে। কিন্তু হয়তো সরে গেছে ওর গোড়ালির নাগালের বাইরে।

শরীরের উপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছে রানা। থরথর করে কাঁপছে পেশীগুলো, চেষ্টা করেও থামাতে পারা যাচ্ছে না।

'আছে! আগের জায়গাতেই আছে গর্তটা।'

প্রায় চিৎকার বেরিয়ে এল রানার গলা চিরে। বাঁচার মরিয়া আকাঙ্ক্ষা যেন শরীর আর মনটাকে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করতে চাইছে। শরীরটা স্থির হলো মুহূর্তের জন্যে। বাঁ পা-টাকে আরও এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দিল রানা।

রক্তের মত উষ্ণ পানিতে ঢুকল গোড়ালিটা। শরীর আবার কাঁপতে শুরু করেই থেমে গেল। গর্তের ভিতর পানি জমে আছে। গোড়ালির প্রায় সবটা ঢুকে গেছে ভিতরে।

সামনের পদক্ষেপগুলোর উপর এখন নির্ভর করছে জীবন অথবা মৃত্যু। আরও উপরের খাঁজটা ধরতে হবে বাঁ হাত দিয়ে।

হাত বাড়াল রানা। চঞ্চল বাতাসে ভর করে কয়েক ফোঁটা হলুদ পানি মৌমাছির মত উড়ে এসে পড়ল ওর চোখেমুখে। সালফার আর লবণ মেশানো পানি পেট্রলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল যেন চোখে। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে রানা। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে চোখ। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলার ভিতর থেকে। মুখের ভিতর নোনা পানি ঢুকে গলায় আটকে গেছে।

গোটা শরীর দুমড়ে একটা স্তূপের আকার নিতে চাইছে। মরিয়া হয়ে লাফ দিতে গেল ও, কিন্তু ক্লান্তিতে অবশ পেশীগুলো এতটুকু সাড়া দিল না।

আঁতকে উঠল রানা। বিরাট এক মুখ ওকে গ্রাস করল এক নিমেষে। আতঙ্কের।

এইটাই চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। শরীর বিদ্রোহ করে বসেছে, মানছে না ওর নির্দেশ।

অসহায় লাগছে রানার। একচুল নড়ার শক্তি নেই ওর। এইভাবে লটকে কতক্ষণই বা! যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়বে শরীরটা।

অনুভূতি ও বোধ শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হঠাৎ চোখের সামনে মেজর জেনারেলের মুখটা ভেসে উঠল। দু'চোখে ভ্রূকুটি।

স্নায়ুগুলোকে যেন নির্দেশ দেওয়াই ছিল, কাঁচা পাকা ভুরুজোড়া দেখেই শরীরটা সাড়া দিল হঠাৎ। যেন কেউ সুইচ টিপে অন্ করে দিল ওকে।

কঠিন পরীক্ষা সামনে। চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল রানা। নতুন পা রাখার জায়গাটা এখন একমাত্র ভরসা বা সম্বল ওর। বাঁ পায়ের সবটুকু জোর দিয়ে লাফ দিতে হবে ওকে। লাফ দেয়ার সময় পাথরের সাথে ধাক্কা লাগলে ছিটকে পড়বে ও। বাঁ হাতের গর্ত থেকে এখন আঙুল দুটো বেরিয়ে আসবে। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আরও দশ ইঞ্চি দূরের একটা গর্তের কিনারা ধরে ফেলতে হবে। একই সময়ে ডান পা-টাকে ভাঁজ করে পাহাড়ের এধারে নিয়ে আসতে হবে। তখন বাম পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচেই যে গর্তটা রয়েছে সেটায় ঢুকবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা।

গর্তের ভিতর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঢোকা মাত্র লাফ দিতে হবে

আবার বাঁ দিকে। বাঁ পা তার নিরাপদ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে সেই সাথে। হঠাৎ শুরু হয়েছে পাথরের শেলফ, ইঞ্চি কয়েক দূরে সেটা, বাঁ পা তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওখানে আশ্রয় নেবে। এত কিছু ঘটবে দেড় থেকে দুই সেকেন্ডের মধ্যে। এরই মধ্যে, ওর ডান হাত দখল করবে বাঁ হাতের ছেড়ে যাওয়া গর্তটা।

বাম পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে গোটা শরীরটা ঘোরাতে হবে রানাকে—বাঁ দিকে। বাঁ হাত মুক্ত হয়ে যাবে। ডান পা যথাসম্ভব সেঁটে যাবে পাথরের সাথে, বাঁ পা-কে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে।

বাম পা-টা পড়বে ঝুল বারান্দায়। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে সেটা। স্বাভাবিক দুই পদক্ষেপে ঢালু ঝুল-বারান্দার একটা গহ্বরে পৌঁছে যাবে রানা। নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে শুধু তখনই।

ঘনঘন কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল রানা। মনের সবটুকু জোর দিয়ে পেশীগুলোকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিল। বিশ্বস্ত কিন্তু ক্ষতবিক্ষত একটা সেনাবাহিনী যেন ওগুলো, রানার হুকুমে সক্রিয় হয়ে উঠল মুহূর্তে!

প্রতিবাদ বেরিয়ে এল রানার গলার ভিতর থেকে। গোটা শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে আসছে। কিছুই টের পেল না রানা। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ও, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে না কিছুই।

লাফ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা শিকারী ঈগল দেখতে পেল সে। হাত বিশেক উঁচুতে, ঠিক মাথার উপর বসে আছে একটা কার্নিসে। দীর্ঘ গলাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে হলুদ চোখ দিয়ে দেখছে রানাকে। বিস্ময় ও কৌতুক যেন দু'চোখ থেকে উপচে বেরুচ্ছে।

দু'সেকেন্ডের ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছে।

ওকে পিছনে রেখে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে সময়, অনুভব করল রানা। প্রতি ঘণ্টায় একচুল পরিমাণ নড়ছে ও, মনে হলো ওর। উপর ও সামনের দিকে সরে যাচ্ছে ও, বিশাল পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা আহত পিঁপড়ের মত।

শূন্যে লাফিয়ে পড়ল রানা। সব আলো যেন নিভে গেল এক পলকে। ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানার মন। এ ভুল সংশোধনের অযোগ্য। সব শেষ। সামান্য একটা ভুল, নিজেকে জীবন থেকে মৃত্যুতে স্থানান্তরিত করছে ও।

পরমুহূর্তে ভুলটা ভাঙল ওর। পাথরের শক্ত ঝুল-বারান্দার সাথে বাড়ি খেল বুকটা। লম্বা করে দেওয়া হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরল গহ্বরের কিনারা।

পাথরটা ঠিক যেন একটা কবর। উঠে বসল রানা। হাঁপাচ্ছে। কৃতজ্ঞ বোধ করল সে একজোড়া কাঁচাপাকা ভুরুর কাছে। কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে চাইল না

সে আর।

এখন শুধু নিরাপদ ঢালু বেয়ে সুলতানের গ্রামে নেমে যাওয়া। এই অকৃত্রিম ঝুল-বারান্দা থেকে তিনহাত চওড়া কার্নিস ধরে মাইল দুয়েক, আর নিচে নেমে সাগরের তীর ধরে আরও এক মাইল হাঁটা পথ। তারপর সুলতানের গ্রাম।

দাঁড়াতে গিয়ে শরীরটা টলে উঠল একবার। একে একে খুলে ফেলল শার্ট, গেঞ্জি, ট্রাউজার। জলপ্রপাতের পানিতে ভিজে গেছে সব। ওগুলো রোদে শুকাতে দিয়ে বসল ও। ট্রাউজারের পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করল। নলের ভিতর থেকে টপ টপ করে ক'ফোটা পানি ঝরে পড়ল পাথরে উপর।

সময়ের আর কোন অভাব নেই। কাপড়গুলো উল্টেপাল্টে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিল সব। পরে নিল ধীরেসুস্থে।

ওয়ালথারটা শুকিয়ে যেতে সেটাকে খুলে পরিষ্কার করে নিল রানা। ট্রাউজারের পকেটে ভরতে যাবে ওটা, হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠতে দেখল ও।

একটা তামাটে হাত। ওপর থেকে কালো পাথরের উপর চলে এসেছে কনুই পর্যন্ত। আঙুলগুলো খুঁজছে কি যেন। শেষ সূর্যের আলোয় কড়ে আঙুলে পরা আঙটির বড়সড় মুক্তোটা কোমল দ্যুতি ছড়াচ্ছে রানার চোখে।

'লাভ নেই, দাতাকু,' বলল রানা, 'পারবে না তুমি।'

হাতটা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল, হিংস্র একটা সরীসৃপ যেন বিপদ আঁচ করতে পেরেছে।

তাকিয়ে আছে রানা। দেখছে। প্রায় এক মিনিট কাটল। তারপর আবার সচল হলো হাতটা। ভিজে পাথরে কিলবিল করতে শুরু করল পাঁচটা আঙুল।

'দাতাকু,' একটু জোর গলায় বলার লোভটা সামলাতে পারল না রানা, যাতে পাহাড়ের গায়ে লেগে শব্দগুলো দু'একটা প্রতিধ্বনি তোলে, 'কষ্ট না করে নিজেই ফেলে দাও নিজেকে। বিশ্বাস করো, আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে ওখান থেকে এদিকে আসা সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও সম্ভব হয়েছে শুধু দু'বছর আগে একবার এসেছিলাম বলে।'

হাতটা থামল এবার।

আরও আধ ইঞ্চিটাক সামনে বাড়ল হাতটা। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল আঙুলগুলো। আর বড়জোর সিকি ইঞ্চি এগোবে হাতটা, তার বেশি সম্ভব নয়, অনুমান করল রানা। কিন্তু গর্তটা দু'ইঞ্চি দূরে এখনও।

'আমার চেয়ে লম্বায় দু'ইঞ্চি খাটো তুমি, দাতাকু,' বলল রানা। 'সেই অনুপাতে তোমার হাতও ছোট। শেষ পরাজয়টা তোমার ওখানেই।—প্রকৃতির কাছে।'

অন্ধের মত পাথরে ঘষা খাচ্ছে হাতটা। মুঠো হয়ে যাচ্ছে আঙুলগুলো,

খুলে যাচ্ছে পরমুহূর্তে।

'আর যদি কোণের দিকে তোমাকে দেখতে পাই, আমার জীবনের সহজতম টার্গেট হবে তুমি।'

হাতটা স্থির হয়ে গেল। ধীরে গুটিয়ে নিল সেটাকে দাতাকু। অদৃশ্য হয়ে গেল ওধারে।

'রানা!' ডাকল দাতাকু।

'হ্যালো!'

'তোমার কথা বিশ্বাস করছি, সত্যি একটাই মাত্র উপায় আছে আমার।'

'হ্যাঁ, নিচে পড়ে যাওয়া। ওই একটাই উপায়।'

'আমি বাঁচার কথা বলছি।'

'না, দাতাকু। সে উপায় তোমার নেই। অনেক বাড় বেড়েছিলে, তাই তো তোমার শেষ দেখব বলে এখানে নিয়ে এসেছি আমি।'

'আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এমন, কথাই বেরুল না রানার মুখ থেকে।

খালি পাথরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুলতানের গ্রামের দিকে তাকাল রানা। ফাঁদের দিকে তাকাবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই আর ওর। দু'দুবার আটকা পড়েছিল ওখানে ও। দু'বারের প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা ওর মনে গেঁথে আছে—থাকবে চিরকাল।

'কারণ, তোমাকে আমি চিনি বলে মনে করি, রানা,' বলল দাতাকু। 'কি ধরনের মানুষ তুমি, জানি। স্বীকার করছি, তোমাকে খুঁচিয়ে কষ্ট দিয়ে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু, কই! আমার বিরুদ্ধে কিছুই তো করোনি! কেন করোনি তাও জানি। ভুল করে একটা ক্ষতি করেছিলে আমার, সেকথা ভুলতে পারোনি বলে। আমি বলতে চাইছি, রানা, তুমি বিবেকহীন নও।'

'বেশ। নই। তাতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয়, তুমি আমাকে না বাঁচিয়ে পারবে না।'

'মিথ্যে আশা করছ তুমি।'

'রানা, আমি যদি ক্ষমা চাই?'

'লাভ নেই। তোমাকে আমি চিনি। তুমি সাক্ষাৎ শয়তান। একবিন্দু বিশ্বাস করি না তোমাকে।'

'যদি কথা দিই, জীবনে কখনও আর তোমার পেছনে লাগব না? যদি প্রতিজ্ঞা করি তোমার আর রেবেকার ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না কখনও? তবুও কি বাঁচাবে না আমাকে?'

'না,' বলল রানা। হঠাৎ মনে পড়ল, জোহর কায়ান ওকে প্রশ্ন করেছিল দাতাকুকে ফাঁদে আটকে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে সে প্রতিজ্ঞা পালন

করবে কিনা। উত্তরে ও বলেছিল, না। কিন্তু ওর ধারণা কি ঠিক? কথা দিলে কথা কি রাখবে দাতাকু?

'তোমার কথার দাম কি?' বলল রানা। 'কথা দিয়ে কথা রাখার লোক তুমি নও।'

'ভুল বললে, রানা। কথার মর্যাদা দিই বলেই তো জেল ভেঙে পালিয়ে এসে তোমাকে খুঁজে বের করেছি। নার্সদের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, ভুলে গেছ? চিঠিতে লিখিনি, তোমার ঋণ জীবনে কখনও ভুলব না? জেল থেকে বেরিয়ে শোধ করব? মুখে যা বলি, প্রাণ দিয়ে হলেও তা রক্ষা করতে চেষ্টা করি আমি। তা না হলে এতদিনে ভুলে যেতাম তোমার অপরাধের কথা। ক্ষমা করে দিতাম তোমাকে। কিন্তু তা করিনি—কেন? শুধু কথার মর্যাদা রাখার জন্যে, রানা।'

'বিপদে পড়লে তোমার মত ঘেয়ো কুকুর অনেক কাকুতি মিনতি করেই থাকে,' বলল রানা। 'বৃথা চেষ্টা করছ আমার মন গলাতে। চারজন মানুষকে খুন করেছ তুমি। তোমার ক্ষমা নেই।'

'রানা...'

'আমাকে কি বলেছিলে, মনে আছে, দাতাকু?' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি তোমাকে তাই বলি—নিজের হাতেই শেষ করে ফেলো কাজটা। তোমার কাছে পিস্তল তো আছেই।'

উত্তর দিল না দাতাকু। জবাবের বদলে পাহাড়ের ওধার থেকে নিঃশব্দে একটা হাত বেরিয়ে এল। রোদ লেগে চকচক করছে পিস্তলটা। কোল্ট।

নিজের অজান্তেই পাশে পড়ে থাকা ওয়ালথারটায় হাত চলে গেল রানার। তারপর লক্ষ করল, পিস্তলের বাঁটটা ওর দিকে ধরেছে দাতাকু।

'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হার মানছে,' বলল দাতাকু। 'আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, রানা। আমাকে নিয়ে তুমি এখন যা ইচ্ছা করতে পারো।'

কথা যোগাল না রানার মুখে।

সাড়া না পেয়ে দাতাকুও আর কিছু বলল না। পিস্তল ধরা হাতের আঙুলগুলো সিধে করল সে। ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে গেল পিস্তল।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। বিরক্ত বোধ করল নিজের উপর। চলে যেতে চাইছে ও, কিন্তু কি যেন আটকে রাখছে ওকে, যেতে পারছে না।

কথা যদি দেয় দাতাকু, সত্যি কি রাখবে সে? ভাবছে ও। হয়তো রাখবে...কিন্তু রাখবেই, তার নিশ্চয়তা কি? বিপদে পড়েছে বলে এখন বলছে, বেঁচে গেলে আবার হয়তো...কিন্তু ওকে মরতে দিয়ে আবার একটা ভুল করছে না তো ও? একবার একটা ভুল করে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে, আবার যদি ভুল করে ও...।

শত্রুর সাথে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা জন্মায় মানুষের, কে যেন বলেছিল

কথাটা, মনে পড়ে গেল রানার। শত্রুর প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ এর আগেও অনেকবার অনুভব করেছে ও। এখন আবার সে জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে জেগে উঠছে একটা সহানুভূতি।

প্রতিধ্বনি তুলল চারদিক থেকে দাতাকুর ভারী, ভরাট কণ্ঠস্বর। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, রানা? আত্মসমর্পণ করছি আমি। নিজেকে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোন ক্ষতি করব না আর। একটা সুযোগ দাও আমাকে, রানা। আমি বাঁচতে চাই।'

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো দাতাকুর শেষ কথাটা। আমি বাঁচতে চাই…আমি বাঁচতে চাই…আমি…

তারপর, অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই।

চলে যাচ্ছি না কেন আমি?—ভাবছে রানা। নিজেকে বুঝতে পারছে না ও। একটা দ্বন্দ্ব ওকে আটকে রাখছে।

নিজের কথা ভাবতে শুরু করল রানা। খুব ক্লান্তি লাগছে ওর। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। তিন মাইল পথ পেরোতে হবে, তারপর কপালে জুটবে পানি ও বিশ্রাম।

পানির কথা মনে হতে বড় ঝুল-বারান্দাটা, যেখানে আটকা পড়েছে দাতাকু, চোখের সামনে ফুটে উঠল। ওখানে পানি নেই। খাবার নেই।

কতক্ষণ টিকে থাকবে দাতাকু? ভাবছে রানা। খিদে আর পিপাসায়, নৈরাশ্যে আর আতঙ্কে মাথা কুটবে সে পাথরের গায়ে, চিৎকার করবে। পাগল হয়ে যাবে দাতাকু, কিন্তু কেউ তা দেখবে না, জানবে না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে সে।

শিউরে উঠল রানা। ভাবল, একটা সুযোগ দিয়ে দেখাই যাক না…। পরমুহূর্তে গুলি খেয়ে রুবেনের পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। মনে মনে উচ্চারণ করল ও, না।

'রানা!'

চমকে ঘাড় ফেরাল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ দাতাকুকে দেখে। পাহাড়ের কোণায় ঝুলছে সে। বাঁ হাতের আঙুল রানার সেই অতি পরিচিত ছোট্ট গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে। গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে দাতাকুর। বাঁ পা-টা ঘষা খাচ্ছে এদিকের পাথরে, অবলম্বন খুঁজছে একটা। সালফার মেশানো পানিতে ভিজে গেছে মুখটা। কপালে উঠে গেছে দুটো লাল চোখ। পানি গড়িয়ে নামছে একনাগাড়ে।

ধীরে ধীরে অবিশ্বাসের ভাবটা মিলিয়ে গেল রানার চোখের দৃষ্টি থেকে। দাতাকুর ডান হাত নিশ্চয়ই কোন গভীর গর্ত খুঁজে পেয়েছে, যেটা ওর চোখে পড়েনি বা দেখেও বাতিল করে দিয়েছিল ও, অনুমান করল রানা।

কাজটা নিজের হাতেই শেষ করতে যাচ্ছে দাতাকু।

'আমি আর পারছি না, রানা!' চিৎকার করে উঠল দাতাকু। দম ফুরিয়ে যেতে শেষ দিকের আওয়াজটা নিস্তেজ শোনাল।

অবোধ শিশুকে খোলা পাঁচতলা ছাদের শেষ সীমানায় যেন হামাগুড়ি দিতে দেখছে রানা। শক্ত, টান টান হয়ে গেল শরীরটা। বিশাল ফাঁকটা দেখতে পাচ্ছে, মাত্র ওর কাছ থেকেই আড়াই হাত দূরে। ঝপ করে সোজা নেমে গেছে ষোলো-সতেরোশো ফিট।

'রানা! আমাকে বাঁচাও।' থরথর করে কাঁপছে দাতাকুর পা দুটো। 'লাফ দিয়ে পড়ব আমি। তুমি আমাকে ধরে না ফেললে গড়িয়ে পড়ে যাব···কথা দিচ্ছি···'

কথা শেষ করতে পারল না দাতাকু, গর্ত থেকে ডান হাত খসে গেল তার। গোটা দেহ কোণ থেকে ঝুলে পড়ল। শুধু বাঁ হাতে ঝুলছে সে। মুহূর্তের জন্য আঙুল, খালি পা পাষাণের গায়ে লটকে থাকার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করল। পুরো একটা সেকেন্ড, কিভাবে যেন টিকে রইল দাতাকু ঝুলন্ত অবস্থায়। নিজের কথা মনে পড়ে গেল রানার। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করতে পারছে কি রকম লাগছে এখন দাতাকুর।

মুখটা এক পলকে উপর দিকে উঠে গেল, চিৎকার করছে দাতাকু, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। চিৎকার করছে গোটা মুখটা, শুধু ঠোঁটটা বাদে। ভয়ঙ্কর!

দাতাকু পড়ছে না। ঝুলছে এখনও। ডান হাত দিয়ে মসৃণ পাথরের গায়ে খাবলা মারছে সে। খামচাচ্ছে। নখ উঠে রক্তাক্ত হয়ে গেল দুটো আঙুল। শেষ মুহূর্তটা পেরিয়ে যাচ্ছে। এই পড়ল দাতাকু···পড়ল···পড়ল···

রানার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে এখনও ঝুলে রয়েছে দাতাকু। নতুন একটা গর্ত পেয়েছে তার ডান হাত। তিনটে আঙুল সেটার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করছে সে। জায়গা হচ্ছে না, এক সঙ্গে ঢুকছে না আঙুল তিনটি।

শেষ মুহূর্তে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল দাতাকু, গর্তের ভিতর দুটো আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল এখন। ঢুকল আঙুল দুটো। পেশীগুলো ঢিলে হলো। বাঁ হাত থেকে ডান হাতে ভার রাখতেই ঘুরে গেল গোটা শরীর।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এল আঙুল দুটো। শূন্যে ছিটকে পড়ল দাতাকু। প্রচণ্ড ভাবে ঠুকে গেল মাথাটা ঢালু ঝুল-বারান্দার উপর।

গড়িয়ে নেমে যেতে চাইছে শরীরটা। মসৃণ ঢালু পাথরের উপর হাঁটু, কনুই, আঙুল, বুক আর মাথা দিয়ে নিজেকে উপর দিকে তুলতে চাইছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। আতঙ্কে বিকট মুখ। রানার চোখ দুটোর দিকে চাইল একবার। নেমে যাচ্ছে সড় সড় করে।

বিদ্যুদ্বেগে হাত বাড়িয়ে মুঠো করে ধরল রানা দাতাকুর মাথার চুল। নেমে যাচ্ছিল, টান পড়তে থামল শরীরটা। আরেক হাত বাড়িয়ে দাতাকুর

পিঠের উপরের শার্ট চেপে ধরল রানা। হেঁচকা এক টানে তুলে আনল তাকে নিরাপদ সীমানার ভিতর। তারপর ছেড়ে দিল।

গহ্বরের কিনারা ধরে ফেলেছে দাতাকু। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠছে সে।

গহ্বর থেকে এবার উঠে পড়ল রানা।

'ধন্যবাদ!'

পিছন ফিরে তাকাল রানা। গহ্বরে বসে হাঁপাচ্ছে দাতাক, চেয়ে আছে ওর দিকে। রানা দেখল, দাতাকুর চোখের কোণ আর নিচের ঠোঁট থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে। শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখের কোণ থেকে রক্ত মুছল। জিভে বের করে চেটে নিল নিচের ঠোঁটটা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল ও। পিছন ফিরে তাকাল না।

রানার দিকে চেয়ে আছে দাতাকু। কার্নিস ধরে দ্রুত হাঁটছে রানা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সে। ভুরু কুঁচকে উঠল দাতাকুর। উঠে বসল সে। দাঁড়াল। রানাকে দেখছে। যতক্ষণ দেখা গেল, চোখ সরাল না।

চার

স্বচ্ছ নাইলনের ভিতর ভরাট যৌবন। টু-পীস বিকিনির একটা পীস শুধু নাভির নিচে আটকে আছে। টয়োয়ে..র মিষ্টি গন্ধে অনেক পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। 'অনেক বদলে গেছ তুমি, মিত্রা,' বলল রানা।

'হয়তো,' বলল মিত্রা। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে। 'কিন্তু রানা, তোমার পরিবর্তন কতটা হয়েছে তা তুমি নিজেও বুঝি জানো না!'

'পরিবর্তনের মধ্যে এই যে এখন আমি একজন কৃষক,' বলল রানা।

'এবং একজনের প্রেমিক। কিন্তু আমার নয়। মেয়েটা কে, রানা?'

'চিনবে না,' মিত্রার হাতের লাইটার থেকে চুরুট ধরাল রানা, 'ওর নাম রেবেকা। রেবেকা সাউল।'

'রেবেকা? গুড গড! কোটিপতি ফ্রেডারিক সাউলের মেয়ে রেবেকা সাউল! কি সৌভাগ্য! তোমাদের দু'জনের কাছ থেকেই তাহলে সাহায্য পেতে পারি আমি।'

'তার আগে জবাব দাও রফিককে খুন করা হয়েছে কেন?' মুহূর্তে বদলে গেল রানার কণ্ঠস্বর আর চেহারা। মিত্রার চোখে চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ

করছে ও মিত্রার প্রতি সেকেন্ডের প্রতিক্রিয়া।

চমকে উঠল মিত্রা। 'রফিক! শুনেছিলাম সে কায়ুদানায় এসেছে। কিন্তু, তারপর তো তার আর কোন খবর পাইনি। মারা গেছে?' অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল মিত্রার চোখ দুটো, 'তুমি ঠিক জানো?'

'জানি,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'তোমার চিঠি নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল খুনীটা।'

'হিতাচি মাথরা!' চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরল মিত্রা।

'হ্যাঁ। আসার পথে ব্যারাকে কয়েক হাজার লোক দেখে এলাম। ওদের মতই পোশাক পরেছিল। মাথায় লাল পট্টি, পট্টির কাপড় কোমর পর্যন্ত ঝোলানো।'

রানার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল মিত্রা। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করো আমাকে, রানা! সত্যি আমি রফিকের ব্যাপারে কিছু জানি না।' ইতস্তত করতে দেখল তাকে রানা। 'তবে, এরকম ঘটতেও পারে, স্বীকার করছি। রেড ড্রাগন সিক্রেসি মেইনটেইন করার জন্যে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু করতে বাকি রাখে না।'

'এ-কথার অর্থ?'

'আমরা জানি, কায়ুদানা সম্পর্কে নানান গুজব আছে চারদিকে। কিন্তু গুজবে ক'জনই বা কান দেয়?' সিগারেটটা ঠোঁটে তুলল মিত্রা। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমরা এখানে কি করছি, ক'জন আছি, কিছুই জানে না কেউ। কেউ জানুক তা আমরা চাইও না।'

কঠিন মুখে বসে আছে রানা। মিত্রা থামতেই শান্ত কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার কথার পরিষ্কার উত্তর দাও।'

'বুঝতে পারছ না আমার কথা?' মিত্রা গলা খাদে নামাল। 'রেড ড্রাগন চায় না তাদের সম্পর্কে এখন বাইরের দুনিয়া কিছু জানুক। তাই, যারা এখানে আসে, তারা ফিরে যেতে পারে না কেউ। আমি অন্তত গত চার মাসের ঘটনা জানি। এরমধ্যে ছয়জন লোক ঢুকেছিল কায়ুদানায়। তারা সবাই স্পাই বা ব্যাড এলিমেন্ট কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু একজনও ফিরে যেতে পারেনি, এটা জানি। রফিক কায়ুদানার ওদিকটায় এসেছে, এ খবর কানে এসেছিল আমার। ব্যস, আর কিছু জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, রফিক এদিকে আসুক, তা আমি চেয়েছিলাম মনে মনে। এসেছিল কিনা জানি না। যদি এসে থাকে, ফিরে যেতে পারেনি সে—এবং সেইটেই স্বাভাবিক।'

'তুমি চেয়েছিলে রফিকের সাথে তোমার দেখা হোক? কেন?'

'ওর কাছ থেকে তোমার খবর পাব মনে করে।'

'কি দরকার আমাকে তোমার, মিত্রা?'

'বলব,' বলল মিত্রা। 'যতটা সম্ভব বলব আমি তোমাকে, রানা। কিন্তু,

তার আগে কথা দাও, আমাকে তুমি সাহায্য করবে?'

'কি সাহায্য চাইবে তা না জেনেই কথা দেব?'

'রানা!'

'এবার বুঝি আমাকে ভয় দেখাবে?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল রানার কণ্ঠস্বর থেকে।

'রানা...এসব তুমি ভাবতে পারছ?'

'আসল কথা বলো, কি চাও তুমি আমার কাছ থেকে?'

মিত্রার চোখমুখ হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। বিষণ্ন দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে। 'জীবনে যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি,' ধীর, নিচু স্বরে বলল সে। 'জানি, পাবও না কোনদিন। একদিন বুঝি ভালবাসতে তুমি আমাকে, নিজের দোষে হারিয়েছি আমি তোমাকে, কিন্তু সে স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যেই যেন মুছে যায়নি মন থেকে। রানা, কি পেলাম জীবনে? তুমি জানো, ছোটখাট জিনিসের ওপর কোন টান নেই আমার। যখন যা চেয়েছি, সেরা জিনিসটাই চেয়েছি। আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ তুমি, যার সাথে আর কারও তুলনা হয় না। তোমাকেই চেয়েছিলাম তাই।'

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল মিত্রা। সিগারেটটা পুড়ছে আঙুলের ফাঁকে। কামরার ভিতর পিন-পতন স্তব্ধতা। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল মিত্রা। 'তুমি হয়তো বিশ্বাস করো না, কিন্তু কি জানো, তোমাকে ভালবাসার পর আর কাউকে ভালবাসা যায় না। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলব না, চেষ্টা যে করিনি তা নয়। পারিনি।' খাদ থেকে হঠাৎ চড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। 'রানা, বলতে পারো, কি নিয়ে বাঁচব আমি?'

কিছুই যেন বলার নেই রানার। নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে চুরুট ধরাল ও। ধোঁয়ার আড়ালে মুখ লুকাল। মিত্রার দুঃখটা অন্তত অনুভব করে ও। উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ।

উঠে পড়ল মিত্রা। মুখ তুলে তাকাল রানা। ওয়াল কেবিনেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে মিত্রা।

দু'হাতে দুটো হুইস্কি ভর্তি গ্লাস নিয়ে ফিরে এল।

অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল মিত্রা। রানার গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে নিজেরটা তুলে মৃদু চুমুক দিল পরপর দু'বার। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল তেপয়ের উপর ঠক্ করে। 'বাঁচার একটা উপায় বের করে ফেলেছি আমি, রানা। সে-কথাই আজ তোমায় বলব। তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ, এ আমার কতটুকু আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। রানা, তুমি জানো, চিরকালই আমি যা চাই, খুব বড় করে চাই। এখন ক্ষমতা চাইছি আমি, এমন ক্ষমতা যে আমার কথায় মানুষ বাঁচবে, আমার কথায় মানুষ মরবে—এই ক্ষমতা পেতেই হবে আমাকে। তুমি

জানো, ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস ত্যাগ করেছি আমি? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রেড ড্রাগনের ভেতর নিজের আসন তৈরি করেছি আমি. রানা। সুলতানের পরই ওর স্ত্রী হিসেবে আমার গুরুত্ব এখানে। কিন্তু আমি চাই সবার উপরে উঠতে। রানা, আমি চাই, এই ব্যাপারটাতেই তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

শব্দ করে হাসল রানা। 'এত কাঁচা বুদ্ধি তোমার, ভাবিনি,' বলল ও। 'কতটুকুই বা শক্তি এই রেড ড্রাগনের! এর নেতৃত্ব কতটুকু ক্ষমতা এনে দেবে তোমার হাতে? তাছাড়া, ইন্দোনেশিয়ার সরকার এত দুর্বল নয় যে…'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ় গলায় বলল মিত্রা, 'রগনাম লার্তোর মৃত্যুর পর রেড ড্রাগন যে নতুন করে সংগঠিত হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে তা তুমি কিছু জানো না, তাই এ কথা বলছ। একটা মাত্র ব্যারাক দেখে এসেছ তুমি, ওরকম আরও কয়েকটা ব্যারাকভর্তি লোকবল রয়েছে আমাদের। ধরো, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি দ্বীপ থেকেই প্রতিনিধি পেয়েছি আমরা। আমাদের গান-বোট সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছে উপকূল এলাকায়…'

'ইন্দোনেশিয়ান এয়ার-ফোর্সের মাত্র আধঘণ্টা লাগবে…'

'আকাশ পথে ওরা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না, রানা,' বলল মিত্রা। হাসছে সে। 'পাহাড়ে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বসানো আছে। আক্রমণ শুরু করার আগে কেউ আমাদের সম্পর্কে খবর পেয়ে যাক তা আমরা চাই না বটে, কিন্তু যদি জানাজানি হয়েই যায়, তার জন্যেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি আমরা। কয়েকটা স্যাবর জেটেরও ব্যবস্থা হচ্ছে, ওগুলি পেতে অবশ্য একটু সময় লাগবে। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী দরকার আমাদের হেলিকপ্টার। এ ব্যাপারেই তোমার আর রেবেকার সাহায্য চাই আমি, রানা।'

'হেলিকপ্টার?'

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করল মিত্রা। 'প্রত্যেক শনিবার দুপুর দেড়টায় বালি হেলিপোর্টে দুটো কপ্টার নামে। বিশ মিনিটের যাত্রা বিরতি ওখানে। ছোট্ট হেলিপোর্ট, বিশজন রেড ড্রাগনই যথেষ্ট। যা করার ওরাই করবে। তুমি আর রেবেকা শুধু উড়িয়ে নিয়ে আসবে কপ্টার দুটোকে এখানে।'

'কিন্তু,' রানা বলল, 'তোমার পরিকল্পনায় প্রকাণ্ড একটা খুঁত রয়েছে যে! আমরা কেউই কপ্টার চালাতে জানি না।'

'তুমি কপ্টার চালিয়ে টিটাগড় থেকে খুলনায় নিয়ে এসেছিলে আমাকে, রানা,' মিত্রা গম্ভীর। 'আর রেবেকা সাউল একজন নাম করা হোয়েলস্পটার পাইলট, আমার জানা আছে। আমার চোখে অত সহজে ধুলো দিতে পারবে না।'

অসম্ভব কিছু একটা বলবে মিত্রা, অনুমান করতে পেরেছিল রানা। কিন্তু হাইজ্যাক করা কপ্টার এনে দিতে বলবে, ভাবতে পারেনি। মুখের উপর

অক্ষমতা প্রকাশ করতে যাবে, বাধা দিল মিত্রা।

'না,' বলল সে, 'হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না, রানা। গোটা ব্যাপারটা সময় নিয়ে আরও ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি তোমাকে। প্লীজ, রানা, আমার অবস্থাটা একটু বিবেচনা করো।'

'কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে অনুরোধ করছ কেন?'

'আমাদের পাইলট নেই।'

'বিদ্রোহীরা তাহলে কারা? সবগুলোই কি গুণ্ডা-বদমাশ?'

ব্যঙ্গটা নিঃশব্দে হজম করল মিত্রা। বলল, 'রানা…'

'শোনো, মিত্রা। তুমি জানো, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করি না।'

'ভুল বুঝছ তুমি, রানা,' মিত্রা বলল, 'রেড ড্রাগনের সাথে তুমিও জড়িয়ে পড়ো, এ আমি চাই না। আমি শুধু চাইছি…'

'একটা বৈধ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছ তোমরা…'

'স্বৈরাচারী সরকার বৈধ হলেও…'

'কিন্তু তোমরা কারা? রেড ড্রাগনের উদ্দেশ্য কি? তারা ক্ষমতায় গেলে চুটিয়ে লুটপাট আর শোষণ করবে এ তো জানা কথা…'

'রানা!'

'তাছাড়া, রফিকের মৃত্যুর জন্যে যে শক্তি দায়ী তাকে আমি আমারও শত্রু বলে মনে করি।'

'তুমি…'

'তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই আমি, মিত্রা।'

'পরামর্শ?'

'রেড ড্রাগন থেকে পালাও,' বলল রানা, 'সম্ভব হলে আজই। এর ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

মিত্রার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, লক্ষ করল রানা।

'কপ্টার যোগাড় করার দায়িত্বটা আমি যেচে পড়ে কাঁধে নিয়েছি, রানা। যোগাড় করতে পারা না পারার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।' গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন মিত্রাকে, 'ওদের আমি কথা দিয়েছি, রানা। কথা রাখতে পারলে রাতারাতি ওদের চোখে আমি অনেক বড় হয়ে যাব। এর আগে আমারই বুদ্ধি এবং পরামর্শে গানবোট আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান পেয়েছে ওরা। বার্নো কাকাকু পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছে আমার পরিকল্পনায়। কপ্টারগুলো যদি আনাতে পারি, অর্ধেকের বেশি রেড ড্রাগন আমার অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠবে। সুলতানের রক্ষিতাই শুধু নয়, সহকর্মীর মর্যাদা লাভ করব আমি। আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছ তুমি, রানা?'

'বুঝেই বা করব কি?'

'রানা, প্লীজ!'

'দুঃখিত, মিত্রা।'

থমথম করছে মিত্রার চোখমুখ। রানার মুখের দিকে তিন সেকেন্ড চেয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'তুমি জানো, এর জন্যে করতে পারি না এমন কাজ বোধহয় নেই।'

'অনুমান করতে পারি,' বলল রানা, 'কিন্তু ভয় পাই না।'

রানা হাসছে।

গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল মিত্রা। ধীরে ধীরে বলল, 'ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রানা, তোমার সিদ্ধান্ত তুমি বদলাও—স্পর্ধা দেখানো হয়ে যাচ্ছে, তবু বলছি কথাটা।'

'সময় নষ্ট করছ শুধু।'

'এই তোমার শেষ কথা, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'কোন কিছুর বিনিময়েই কি তুমি সিদ্ধান্ত বদলাবে না?'

হেসে উঠল রানা। বলল, 'না।'

বদলে গেল মিত্রার মুখের রেখাগুলো। 'আর একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করছি তোমাকে আমি, রানা।' যদিও অনুরোধের মত শোনাল না তার কণ্ঠস্বর।

'দুঃখিত, মিত্রা। যা ভাবার ভাবা হয়ে গেছে আমার। মিত্রা, কিছু যদি মনে না করো, এবার আমি উঠতে চাই।'

মুখের চেহারা নির্বিকার রানার। তাকিয়ে আছে মিত্রার মুখের দিকে। প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করার চেষ্টা করছে।

'না,' দৃঢ় গলায় বলল মিত্রা। উঠে দাঁড়াল সে। চঞ্চল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ওয়াল কেবিনেটের সামনে। হুইস্কির বোতলটা নিয়ে ফিরে এল আবার।

দুটো গ্লাসেই হুইস্কি ঢালল মিত্রা। নিজেরটায় চুমুক দিল ঘন ঘন।

'রানা, কি ভেবে তুমি সাহায্য করতে চাইছ না আমাকে, আমি জানি,' বলল মিত্রা। 'ভালবাসি, তাই তোমার গায়ে হাত তুলতে বা কোন কাজে বাধ্য করতে পারব না—এই তোমার ধারণা। ধারণাটা যে মিথ্যে তা বলছি না। কিন্তু, রানা, প্লীজ, ওটার ওপর ভরসা কোরো না তুমি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পারি না এমন কাজ বোধহয় নেই।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

বাঁকা একটু হাসল রানা। 'বেশ। বাধ্য করার চেষ্টা করেই না হয় দেখো! আমাকে তো চেনো, পারবে বলে মনে হয়?'

চুপ করে রইল মিত্রা। খানিকপর বলল, 'খুলেই বলি তাহলে, রানা। আমি চাইলেও তুমি আর এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে না।'

একটু যেন তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি।

'পরিষ্কার করে বলো কথাটা।'

'তোমাকে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনিয়েছি আমি। সবাই জানে কারণটা। তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরুলেই সুলতান জানতে চাইবে তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছ কিনা। ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে বলতে হবে তুমি রাজি হওনি।'

'তারপর?' রানার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ।

'রেড ড্রাগন তোমাকে এই দ্বীপ থেকে কোথাও যেতে দেবে না, রানা। বিশ্বাস করো, ওদেরকে নির্দেশ দেয়ারও দরকার নেই। ওরা জানে, ওদের বিশজনকে সাথে নিয়ে আজই সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হবে তুমি। যখন দেখবে তুমি একা ফিরে যাচ্ছ, যা বোঝার বুঝে নেবে ওরা।'

রানার মুখটা ঘামছে। 'সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিত্রা।'

'বিশ্বাস করো, রানা,' ফিসফিস করে বলছে মিত্রা। 'কায়ুদানার এই অংশ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে যেতে পারেনি। হাজার হাজার রেড ড্রাগন ধাওয়া করবে তোমাকে। তুমি একা···প্লীজ, রানা! ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো!'

'আগেই বুঝেছি,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেবে না জানি, তাই বিদায় চাইছি না আর।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে আবার বলল ও, 'চললাম, মিত্রা।'

দৃঢ় পায়ে এগোল রানা দরজার দিকে।

'রানা, শোনো!'

দাঁড়াল রানা। পিছন ফিরল না।

'রানা, প্লীজ!'

দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মিত্রার দিকে। 'আর হয়তো দেখা হবে না, মিত্রা। আমি দুঃখিত। চিত্রাকে জানাব তোমার অধঃপতনের কথা। বেচারী তোমার জন্যে বড্ডো উদ্বিগ্ন।'

নির্জন বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। রেড ড্রাগনের ফাঁদে পা দিয়েছে ও। বেরুতে পারবে তো?

লম্বা বারান্দা ধরে বাঁকের দিকে এগোল রানা। পিছন দিকে তাকাল একবার। না, বারান্দায় বেরিয়ে আসেনি মিত্রা।

বাঁকের মুখে ঘুরতে যাচ্ছে, তখনই কিছু একটা আঁচ করল রানা। থমকে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে বাঁকটা নেয়া হয়ে গেছে।

সামনে আরেকটা প্রশস্ত বারান্দা। কেউ নেই। শেষ প্রান্তে পলকের জন্যে শুধু দেখা গেল একটা সাদা হ্যাট।

দাতাকু!

পাঁচ

ছুটল রানা।

বারান্দার একদিকে রেলিং, অপরদিকে পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা। সবগুলো বন্ধ, শুধু শেষ মাথার কাছে একটা দরজা খোলা। কেন যেন মনে হলো, ওই দরজা দিয়েই একটু আগে বেরিয়ে গেছে দাতাকু।

শেষ মাথার রেলিংয়ের দিকে চোখ রানার। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দাতাকুকে।

বিরাট এলাকা জুড়ে সুপারি গাছের ঝাড়, তার ভিতর দিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে সে।

ব্যাপার কি? অমন ছুটে পালাচ্ছে কেন দাতাকু? লাফ দিয়ে রেলিং টপকে নিচে নেমে গেছে···কেন?

ও আসছে, বুঝতে পেরেছিল? অসম্ভব! লম্বা বারান্দার অতটা দূর থেকে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা নয় দাতাকুর।

তাহলে? কার ভয়ে পালাল দাতাকু? এসেছে কেন?

খোলা দরজার পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় নিজের অজান্তেই মুখ ফিরিয়ে কামরার ভিতর তাকাল রানা। তারপর যেন প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাজা লাল রক্তে ভেজা একটা হাত, চৌকাঠের কাছে পড়ে রয়েছে। হাতটাকে অনুসরণ করে সুলতানের রক্তাক্ত দেহের উপর গিয়ে থামল রানার দৃষ্টি।

সুলতান বার্নো কাকাকুর পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রায় সবটা শরীরের পাশে পড়ে আছে। চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় চিবুক উঁচিয়ে আছে সে। স্থির হয়ে আছে চোখের মণি দুটো।

এক পা এগিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল রানা।

লোকটা বেঁচে আছে এখনও?

নিমেষে বিস্ফারিত হয়ে গেল সুলতানের চোখ দুটো। মণি দুটো ঘুরছে। দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পেরে মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। সুলতান তার খুনীকে চিনতে পারেনি? শত্রুপক্ষের একজন বলে মনে করছে সে ওকে?

কামরার ভিতর ঢুকল রানা কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না যেন। বাঁচার কোনও আশা নেই সুলতানের। ঘাড়ের উপর ভোজালির কোপটা বাঁ হাতটাকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কাঁধ থেকে।

ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল সুলতানের নাক দিয়ে। হাঁটু মুড়ে পাশে বসল রানা। ঠিক তখনই পিছন থেকে কারও পায়ের শব্দ ভেসে এল কানে। নিজের বিপদটা টের পেল রানা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ,' মিত্রা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ রানার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সুলতানের লাশ দেখতে পেল সে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল মিত্রা।

কষে একটা চড় মারল রানা মিত্রার গালে। টলে পড়ে গেল সে বারান্দার একধারে। কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটা তাতে থামল না। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখল রানা মিত্রার আচরণে। হাত-পা ছুঁড়ছে। ভয়ে সরে যেতে চাইছে রানার নাগালের বাইরে।

ফাঁকা গুলির আওয়াজ ভেসে এল কাছাকাছি কোথাও থেকে। সেই সাথে একটা শোরগোল। এগিয়ে আসছে।

দ্রুত ভাবছে রানা। মিত্রা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে…আর সুলতানকে ও যে খুন করেনি কাউকে তা এখন আর বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়।

পালাতে হবে।

চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে ছুটল রানা। রেলিং টপকে নিচে পড়ল।

দ্বীপের এদিকটা ওর সম্পূর্ণ অচেনা।

পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে গেছে পথটা।

ঢং ঢং ঢং ঢং করে পাগলা-ঘণ্টা বাজছে, বিপদ-সঙ্কেত, গ্রাম থেকে বাতাসে ভেসে আসছে তার একঘেয়ে, উত্তেজক শব্দ। ঘণ্টা বাজছে দূরে, আওয়াজটাও মৃদু, কিন্তু স্নায়ুতে আঘাত করছে প্রতিটি ধ্বনি। তাড়া করছে ওকে।

সুপারি গাছের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে আসার সময় দেখে এসেছে রানা, ব্যারাক থেকে শয়ে শয়ে রেড ড্রাগন ছুটে বেরুচ্ছে অস্ত্র হাতে নিয়ে।

এই পথের শেষ কোথায় জানা নেই রানার। হয়তো খাড়া পাথরের প্রাচীরে গিয়ে ঠেকেছে। শেষ মাথায় গিয়ে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে হবে ওকে।

বুঝতে পারছে রানা, ভুল কয়েকটাই হয়ে গেছে। মানুষ ভাবা উচিত হয়নি দাতাকুকে, ঢোকা উচিত হয়নি সুলতানের কামরায়, এমন কি মিত্রার চিঠি পেয়ে এখানে ওর আসাও উচিত হয়নি।

পাদদেশ থেকে আড়াইশো ফিটের মত উঠেছে রানা। পথের শেষ মাথাটা এরপর মিশে গেছে উপত্যকার বুকে।

হাঁপাচ্ছে ও। শেষ ধাপটা টপকে থমকে দাঁড়াল।

দৃশ্যটা ঝাপসা। সামনের বিশাল এলাকাটার দু'পাশে পাথরের ধারাল মাথা সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। আবছা মত দেখা যাচ্ছে বহু দূর পর্যন্ত। হু-হু করে ধোঁয়ার মত নিচে থেকে কুয়াশা উঠছে। পাথরগুলোর নিচের অংশ দেখা যাচ্ছে না, উপর থেকে মনে হচ্ছে ঝুলছে ওগুলো।

সালফার লেক! হলদেটে ধোঁয়ার মত—কুয়াশা নয়, সালফার লেক থেকে বাষ্প উঠছে।

গ্রামের দিকে ফিরতি পথ ধরা ছাড়া এখন উপায় নেই। ঝুঁকিটা যত বড়ই হোক, সামনেই এগোবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। গ্রামের দিকে ফেরা মানে রেড ড্রাগনের রক্ত পিপাসু বাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়া।

ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথটা নিচের দিকে। তর তর করে নামছে রানা। এই লেক থেকে নিশ্চয়ই সাগরের দিকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। সেই পথটাই খুঁজে পেতে হবে, ক্ষীণ একটা আশা ওর বুকে।

উপত্যকার সমতলে নেমে এল রানা। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা গাছের ঝোপ। তারপর খানিকটা শুকনো ঘাস। বাষ্প।

লেকের গরম, ঘোলাটে পানি থেকে হলদেটে বাষ্প উঠছে অবিরাম। বাতাস নেই। ঘন হয়ে ভাসছে বাষ্প।

ক্রমশ গ্রাস করল ওকে হলুদ বাষ্প। উপর দিকে মুখ তুলল ও। আকাশ নেই। খুব জোরাল বাতাস না এলে দূরের কিছু দেখার সম্ভাবনা নেই।

এবং জোরাল বাতাস কায়ুদানায় বছরে দু'একবারই মাত্র আসার সুযোগ পায়। পাথরের উঁচু প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যেতে হয় তাদের। কায়ুদানার স্থির বাতাস কখনও কখনও অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙে, যেমন ভাঙছে এখন।

সাথে সাথে আড়মোড়া ভাঙছে বাষ্প। কোথাও খুব ঘন, কোথাও একটু হালকা। নড়াচড়া করছে। ধীর, এলোমেলো ভঙ্গি।

মাঝখান থেকে সরে এল রানা। কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। প্রত্যেকটা পাথর সালফার লবণের স্তর দিয়ে মোড়া। হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলো রানা। উত্তপ্ত বলে নয়, অসম্ভব পিচ্ছিল ঠেকল বলে। সামান্য শ্যাওলাও জন্মায় না এখানে।

গলা খুশ খুশ করতে শুরু করল রানার। জ্বালা করছে নাকের ভিতরও। বাষ্প ওকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। হলুদ আভায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ।

পায়ের নিচে পানি বা মাটি দেখতে পাচ্ছে না রানা। থামল ও। হালকা হয়ে গেল বাষ্প। মুহূর্তের জন্যে লেকের প্রায় অর্ধেকটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। তারপরই হু হু করে পানি থেকে উঠে এল বাষ্পরাশি। ঢাকা পড়ে গেল দৃশ্যটা।

কিনারার এদিকটা ঢালু। ক্রমশ নেমে গেছে লেকের দিকে। দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিল রানা। এগারো সেকেন্ডের মাথায় দুটো ঘটনা ঘটল পরপর।

হালকা হয়ে গেল ঘন বাষ্প এবং খুক করে কেশে উঠল কে যেন।

বারো সেকেন্ডের মাথায় কান ফাটানো গুলির শব্দ হলো।

মুহূর্তের মধ্যে দেখে নিয়েছে রানা দু'জন রেড ড্রাগনকে। মিত্রার গার্ডদের মতই মাথায় লাল পট্টি এদের। কোমরে ভোজালি। একজনের হাতে একটা পিস্তল। দাঁড়িয়ে আছে লেকের ধারে একটা পাথরের মাথায়।

গুলির শব্দ হতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। পকেট থেকে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এল হাতে। ডাইভ দিয়ে পড়ল একধারে।

মাত্র আধ হাত উঁচু পানি এদিকটায়। হামাগুড়ি দিচ্ছে রানা। পানির নিচে শক্ত পাথর। যতটা ধারণা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গরম এই পানি। একটা হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে সে। ওয়ালথারটার সেফটি-ক্যাচ অন করে ফেলেছে ইতোমধ্যেই।

বড় একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে থামল রানা। চারদিক নিস্তব্ধ। চিৎ হয়ে শুয়ে পানি থেকে মাথা তুলে কান খাড়া করে আছে ও। বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে এল চাপা ফিসফাস আওয়াজ। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

আসছে! পায়ের শব্দ শুনে বুঝল রানা। শব্দ লক্ষ্য করে ওয়ালথার ধরা হাতটা নড়ল একটু: অপেক্ষা করছে।

হলুদ আবছায়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। উত্তেজিত সংলাপগুলো শুনতে পাচ্ছে রানা।

'তোর কাশির শব্দেই সব ভেস্তে গেল,' চাপা মালয়ান কণ্ঠস্বর।

'ব্যাটাকে পড়তে দেখেছি আমি,' আরেক রেড ড্রাগন বলছে। 'তুই গুলি করলি অমনি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পরিষ্কার দেখেছি। পানিতে পড়েছে।' কথার শেষে রানার মাথার উপর পাথরটায় পা রাখল সে।

পাথরটার নিচে উবু হয়ে আছে রানা। মুখ তুলে পাথরটার মাথা দেখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। গভীর বাষ্প ঢেকে রেখেছে উপরের অংশ।

হঠাৎ এল হালকা একটা বাতাস, ছিন্নভিন্ন করে দিল বাষ্পকে। লেকের কিনারা, তীর ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। ডান হাত উপর দিকে তুলল রানা।

পেশীবহুল একজোড়া পা, হাঁটু পর্যন্ত। ডান পায়ের হাঁটুর নিচে ঝুলে রয়েছে ধারাল একটা ভোজালি।

রানার মুখ থেকে মাত্র পঁচিশ ইঞ্চি উপরে। আরও এক জোড়া পা-কে পাশে জায়গা করে নিতে দেখল রানা।

'বাষ্প সরে গেলেই হয় এখন,' বলল একজন। আর কি বলতে যাচ্ছিল

তার আগেই লোকটার ডান পা ধরে হেঁচকা টান মারল রানা। পানিতে পড়ার আগেই ছেড়ে দিল লোকটার পা। শব্দ হলো পানিতে। অন্য লোকটারও ডান পা ধরে টান মারল রানা, তারপর পা-টা ছেড়ে দিয়েই ছুটল।

পানিতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তখন প্যাঁচ কষছে ওরা। বাষ্পের একটা স্তর ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে যুদ্ধরত দু'জনকে।

পাহাড় থেকে নেমে সৈকতে রেড ড্রাগন দু'জনের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করল রানা। অনুসরণ করে পৌঁছুল একটা নৌকোর কাছে।

নিস্তেজ সাগর। দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে রানা। গ্রামে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে বুঝতে পেরে দমে গেছে ওর বুক।

এর মধ্যেই হয়তো সেখানে পৌঁছে গেছে দাতাকু।

ছয়

ডুম-ড্রাম-ড্রাম-ডুম, ডুম-ড্রাম-ড্রাম-ডুম।

থরথর করে কাঁপছে কায়ুদানা। অন্ধকার দ্বীপটার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে রেড ড্রাগন। সুলতান হত্যার প্রতিশোধ চায় তারা। ড্রাম পিটিয়ে খুঁজছে একজন বিদেশীকে। রানা জানে, ওকেই খুঁজছে রেড ড্রাগন।

উদ্বেগে অস্থির হয়ে আছে ওর মন রেবেকার নিরাপত্তার কথা ভেবে। নৌকো নিয়ে আসার সময় ছোট্ট একটা দ্বীপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখেছে ও, ঝাঁকে ঝাঁকে ডিঙি আর স্পীডবোট নিয়ে সুলতানের গ্রাম থেকে রওনা দিয়েছে রেড ড্রাগন। ছোট্ট দ্বীপটাকে তারা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরও আধ ঘণ্টা গা ঢাকা দিয়ে ছিল রানা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাথায় আগ্নেয়গিরির চূড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কায়ুদানা। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ভিতরের আগুনের রঙ লেগেছে তাতে। অনেক উঁচু পর্যন্ত লাল হয়ে আছে আকাশ।

উঁচু পাথুরে সৈকত। থেরাকুনের বাড়ি আরও কয়েকশো গজ দূরে। হেঁটে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে ভেবে নৌকাটাকে টেনে তীরে তুলল রানা।

নৌকোয় বসেই পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিল। পাথরের সাথে দড়ি বেঁধে নৌকোটা ডুবিয়ে দিল পানিতে।

কেউ যেন দেখছে ওকে!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল রানা।

কেউ নেই। কিন্তু পাথরগুলোর আড়ালে? জানে না রানা। দলে দলে

শত্রুরা লুকিয়ে থাকলেও বোঝার কোন উপায় নেই। যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল রানা।

রেবেকার কথা ভাবছে ও। থেরাকুনের বাড়িতে গিয়ে কি দেখবে কে জানে। মিত্রা কি রেড ড্রাগনদের নির্দেশ দেওয়ার সময় পেয়েছে যে রানাকে না পেলে ওর হবু স্ত্রী রেবেকাকে···কিংবা আগে রেবেকাকে, তারপর রানাকে···বিদ্যুৎ চমকের মত হিতাচি মাথরার খুনে চেহারাটা রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে চেনে রেবেকাকে।

বড় একটা পাথরকে পাশ কাটাতে যাচ্ছে রানা তখনই পাথরটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা দেড় হাত লম্বা ভোজালি। আগ্নেয়চূড়া থেকে নেমে আসা লালচে আভায় চকচক করছে সেটা।

এগিয়ে এল ভোজালি ধরা হাতটা, তারপর উঁকি দিল একটা মুখ।

হিতাচি মাথরা।

রক্তের লোভে বড় বড় হয়ে উঠল মাথরার চোখ। চকচক করছে মণি দুটো।

থেরাকুন বাগমার বাড়িতে সুলতানের হত্যাকারীর সন্ধান না পেয়ে সবাই যখন গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, মন সায় না দেওয়ায় মাথরা তাদের সঙ্গে না গিয়ে সৈকতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আগে, সালফার লেকে নাকানি চোবানি খেয়ে যে দু'জন রেড ড্রাগন সুলতানের গ্রামে ফিরছিল তাদের সাথে দেখা হয়েছিল তার। রানা নৌকো নিয়ে রওনা দেয় এ খবর তাদের কাছ থেকেই জেনেছে সে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হিতাচি মাথরা। ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল ভোজালিটা। বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে রানা।

নিঃশব্দে পা বাড়াল মাথরা। হিংস্র শ্বাপদের মত। নাচের ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার উপর তোলা। লাল পট্টির উপর চকচক করছে ভোজালিটা।

তার চোখের সামনে থরথর করে নেচে উঠল যেন মিত্রার উদ্দাম বন্য যৌবন। সুলতান হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলে মিত্রার ডান হাত হতে পারে সে রাতারাতি। ওই যৌবন তখন···

নেকড়ের মত ক্ষিপ্র বেগে ছুটল মাথরা। পায়ের শব্দ নেই এতটুকু। গম্ভীর, ভরাট ড্রাম বাজছে গ্রামে, ডুম-ড্রাম-ড্রাম-ডুম, ডুম-ড্রাম-ড্রাম-ডুম।

চোখের পলকে রানার ঠিক পিছনে পৌঁছে গেল মাথরা। উপর থেকে একটু কাত করে নামিয়ে আনছে সে ভোজালিটা।

এ কোন্ পথ ধরেছে ও? সামনে পাহাড়ের প্রাচীর। থেরাকুনের বাড়ি তো এ পথে নয়। পথ ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়াল রানা। ঠিক সেই সময় সাপের মত ফোঁস করে কেউ যেন দম আটকাল পিছনে। শরীরটা এক

নিমেষে ঘুরে গেল রানার। শত্রু কে তা দেখার আগেই নাক চ্যাপ্টা এক মুখের উপর প্রচণ্ড ঘুষি পড়ল ওর বজ্রমুষ্ঠির।

রানার মাথা থেকে আধ হাত উপরে ছিল ভোজালিটা। ঘুষি খেয়ে তীব্র ব্যথায় অসাড় হয়ে গেল মাথরার গোটা শরীর। খসে পড়ল ভোজালি।

সভয়ে পিঠ বাঁকা করল রানা। ভোজালিটা ওর মাথার চুল ছুঁয়ে পড়ে গেল পিছনের পাথরের উপর।

ঘুষি খেয়ে পিছিয়ে গেছে মাথরা এক পা। চোখের পলকে কোমর থেকে ছোরাটা বের করে নিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে হুঙ্কার ছাড়ল সে।

লাল আলোর আভায় ঝিলিক দিয়ে উঠল ছোরাটা। বাঁ হাত দিয়ে মাথরার ছোরা ধরা হাত ধরে ফেলল রানা, ডান হাত দিয়ে ঘুষি চালাল তলপেট লক্ষ্য করে। ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরটা কুঁজো হয়ে গেল মাথরার।

এবার দু'হাত দিয়ে ধরল রানা মাথরার ছোরা ধরা হাতটা। বাঁকা করে মোচড় দেয়ার সময় হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল দুই ঊরুর সংযোগস্থল লক্ষ্য করে। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে শূন্যে উঠল মাথরা, রানার মাথার উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল পিছন দিকে।

হাঁপিয়ে গেছে রানা। রেবেকার কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইছে মনটা। ধীরে ধীরে পিছন ফিরল ও।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। লোকটা মানুষ না অসুর? আর কেউ অমন ডিগবাজি খেয়ে পড়লে আধ ঘণ্টার আগে নড়তই না।

দু'হাত দিয়ে ধরা ভোজালিটা মাথার পাশে তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিতাচি মাথরা। আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসের হাসিতে মুখটা ভরাট হয়ে আছে।

দ্রুত ভাবছে রানা। পাঁচ হাত সামনে মাথরা, পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করতে পারবে ও? নাকি তার আগেই মাথরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর?

আড়চোখে নিজের দু'পাশটা দেখে নিল রানা। দু'পাশেই ছোট বড় অসংখ্য, বেঢপ সাইজের পাথর ছড়িয়ে আছে। পিছনটা দেখা দরকার। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে চাইল না রানা।

দাঁত বের করে হাসছে মাথরা।

খালি হাত রানার। ওয়ালথার বের করার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ও। গুলির শব্দ হলে শয়ে শয়ে রেড ড্রাগন ছুটে আসবে এদিকে।

এক পা পিছিয়ে গেল রানা।

মাথরা আবার পা বাড়াচ্ছে। রানাও পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে পা তুলছে।

রানার চোখে চোখ মাথরার। যে পথ দিয়ে খানিক আগে এসেছে রানা, সেই পথেই ওকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

স্মরণ করার চেষ্টা করছে রানা পথের ছবিটা। ছড়িয়ে থাকা পাথরের ছোট বড় টুকরোর মাঝখান দিয়ে পথ, সেই পথ দিয়ে এসেছিল ও। একবার

ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে—হাজারবার দিক পরিবর্তন করতে হয়েছে ওকে। ছবিটা স্মরণ করা অসম্ভব।

মাথরার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে রানার কাছে। পিছনের একটা না একটা পাথরে পা ঠেকবেই ওর, আধ সেকেন্ডের জন্যে হলেও তাল হারাবে ও, ঠিক তখনই ভোজালি দিয়ে আঘাত করবে মাথরা।

চোখের দৃষ্টি দেখে সতর্ক হয়ে যাবে রানা, মাথরা তাই রানার পিছন দিকে তাকাচ্ছেই না। আট দশ গজ পিছিয়ে এসেছে রানা। এগিয়ে এসেছে মাথরাও। দূরত্ব সেই আগের মতই, পাঁচ হাত।

পিছনের পাথরের সাথে গোড়ালির ধাক্কা লাগবে, সেজন্যে তৈরি হয়ে আছে রানা।

ধাক্কাটা লাগল পিঠের মাঝবরাবর জায়গায়। অপ্রত্যাশিত বলেই, সতর্কতা সত্ত্বেও তাল হারিয়ে ফেলল রানা।

তিন হাত উঁচু প্রকাণ্ড পাথরটার নিচের দিকটা ফাঁপা। পাথরে পিঠ ঠেকতে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া। মাথাটা হেলে পড়ল পিছন দিকে, পাথরটার সমতল উপরিভাগে।

রানা দেখল ওর দুই চোখের মাঝখানে নেমে আসছে ভোজালিটা। মৃত্যুভয়ে বিস্ফারিত হলো চোখ দুটো। পাথরের সাথে ঘষায় ছিঁড়ে গেল শিরদাঁড়ার উপরের চামড়া। মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিতেই ভোজালিটা পড়ল কানের আধ ইঞ্চি দূরে পাথরের উপর।

মাথা তুলল রানা। একই সময় ভোজালি তুলে নিয়েছে মাথরা। আবার আঘাত করল সে।

বারবার এপাশে ওপাশে মাথা সরিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে রানা। এবার নিয়ে চারবার, ভোজালি তুলছে মাথরা পাথরের উপর থেকে। এবার সে বিরতি নিল এক সেকেন্ড। অদ্ভুত একটা হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। একটা হিসাব ধরা পড়েছে তার কাছে।

একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে মাথা সরিয়ে নিচ্ছে রানা। ব্যাপারটা লক্ষ করে নিজের করণীয় কি বুঝে নিয়েছে মাথরা। রানার মাথা লক্ষ্য করে ভোজালি চালালে প্রতিবারই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আগের বার কোন্ দিকে মাথা সরিয়ে নিয়েছে রানা তা মনে রেখে সে যদি মাথার উপর লক্ষ্য স্থির না করে অপরদিকে ভোজালি চালায়, একবারের চেষ্টাতেই খুলিটা দু'ভাগ করে দিতে পারে।

আগেরবার ডান দিকে মাথা সরিয়ে নিয়েছিল রানা। রানার চোখে চোখ রেখেছে মাথরা। অনুমানের উপর নির্ভর করে রানার মাথার বাঁ দিকের পাথরে লক্ষ্য স্থির করল সে। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে সেদিকে নামিয়ে আনল ভোজালিটা।

ঝুপ করে বসে পড়ল রানা। ভোজালিটা পাথরে পড়ল। তীর বেগে এদিক ওদিক ছুটে গেল ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো। টেনে তুলছে ভোজালিটা মাথরা। তার আগেই তার একটা পা ধরে টান দিল রানা।

ভারসাম্য হারিয়ে বসে পড়ল মাথরা। ভোজালিটা গেঁথে আছে পাথরে। উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা। হাঁটু মুড়েই লাথি চালাল মাথরা। পা-টা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না রানা, ঊরুর উপর লাথি খেয়ে পড়ে গেল ও।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'জনেই। হাত বাড়িয়ে দিল মাথরা ভোজালির উদ্দেশে।

পিছন থেকে মাথরার ঘাড় ধরে ফেলল রানা। ঠেলে পাথরের উপর ফেলল মাথাটা। একটু ঢিল দিতেই উঠে এল সেটা পাথরের উপর থেকে আধ হাত। রফিকের সদাহাস্যময় মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। গায়ে যেন আগুন ধরে গেল সেই মুহূর্তে। দু'হাতের সবটুকু শক্তি দিয়ে মাথরার মাথাটা পাথরের গায়ে ঠুকল রানা।

আর্তনাদ করে উঠল মাথরা। দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করে কি যেন বলল রানা। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছে যেন ও। চুল ধরে মাথাটা তুলল হেঁচকা টানে। তারপর আবার ঠুকল পাথরের গায়ে।

খুলি ফেটে হলুদ মগজ বেরিয়ে পড়তে লাশটাকে ছেড়ে দিল রানা। পায়ের কাছে পড়ল সেটা। পাথরের গায়ে হাত ঘষে রক্ত মুছল ও। ঘুরে দাঁড়াল।

দ্রুত তালে তখনও ড্রাম বাজছে। ডুম-ড্রাম-ড্রাম-ডুম। ছুটল রানা।

দূর থেকে বাড়িটাকে অন্ধকার দেখে ছ্যাঁত করে উঠল বুক।

পাথর কাটা সিঁড়ির ধাপ টপকে ওঠার সময় থমকে দাঁড়াল রানা। জমাট বেঁধে গেছে ধাপের উপর রক্ত। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে রক্তের শেষ মাথায় একটা ধাপের উপর গলাকাটা লাশটা দেখতে পেল ও।

হাঁটু মুড়ে বসল রানা লাশটার পাশে। পুরুষ মানুষের লাশ। না, থেরাকুনের নয়। লোকটাকে চিনত ও, বাড়ির কাজকর্ম করত।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। উপরে উঠে কি দেখবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল একবার। একসাথে দুটো করে ধাপ টপকে ছুটল আবার।

উঠানে কেউ নেই। পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা। পাঁচিল ঘেঁষে এগোল ও। জালঘেরা বারান্দাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার স্থির হয়ে আছে চারদিকে।

কাছেপিঠে শব্দ নেই কোন। দূরে ড্রাম আর শোরগোলের শব্দ। শিকারে বেরিয়েছে যেন রেড ড্রাগন।

রেবেকার নাম ধরে চিৎকার করে ওঠার ব্যাকুলতাটাকে অতি কষ্টে দমন

করল রানা। বারান্দায় উঠল নিঃশব্দ পায়ে। সামনের কামরাটা থেরাকুনের। ভিতরে ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলো কাঁপছে বারান্দায়।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কামরার ভিতরে উঁকি দিতেই মানুষের কাটা একটা মাথা পড়ল সশব্দে মেঝেতে। আঁতকে উঠল রানা। সিলিংয়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখল, দড়ির সাথে বাঁধা রয়েছে দুটো পা। নিচের দিকে ছিল মাথাটা, চামড়ার সাথে ঝুলছিল, বাতাস একটু জোর দিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে।

থেরাকুনের চাকর লোকটা। ভিতরে ঢুকল না রানা। দেখার আর কিছু নেই।

ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস পেল রানা। পা উঠতে চাইল না। পাশেরটাই ওর আর রেবেকার কামরা। কি দেখবে ও ওখানে? থেরাকুন কি সবাইকে নিয়ে ওদের কামরাতেই লুকিয়ে ছিল···? সবগুলো লাশ ওখানেই কি···?

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। বুকের ভিতর ঠাণ্ডা হিম একটা ভয়।

এক এক করে বাকি সব কামরা দেখে নিল রানা। বাড়িতে কেউ নেই। কাশমার লাশ ছাড়া আর কাউকে দেখল না ও।

উঠানে বেরিয়ে এল ও। অসংখ্য মশাল দেখা যাচ্ছে গ্রামে। ছুটোছুটি করছে রেড ড্রাগনরা। রেবেকা কি ওদের হাতে ধরা পড়েছে? নাকি থেরাকুন বিপদ আঁচ করতে পেরে আগেই তাকে নিয়ে লুকিয়েছে কোথাও?

পাশের ঝোপটা হঠাৎ নড়ল বলে মনে হলো যেন? অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দুলছে বলে মনে হলো না রানার। নড়ে উঠলে, এরই মধ্যে থামত না দোলাটা।

চোখ ফিরিয়ে নেবে, এমন সময় রানা দেখল ঝোপের অপর দিক থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসছে। দাতাকু···। পরমুহূর্তে ভুলটা ভাঙল রানার।

'সাহেব!'

'মেমসাহেব কোথায়?' কণ্ঠস্বরটা থেরাকুনের কর্মচারী লারাঠার বুঝতে পেরেই চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

'বোটে···'

ছুটল ওরা।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল রানার সামনে লারাঠা।

'কি হলো?'

রানার প্রশ্নের জবাব দিল না লারাঠা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। রানার মনে হলো, কেঁদে ফেলবে। ঘাড়

ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল আবার সে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করল রানা।

দুটো জিনিস চোখে পড়ল রানার। চাঁদ উঠেছে। আর আগ্নেয়গিরির মুখে এক বিন্দু ধোঁয়ার রেশ পর্যন্ত নেই।

ভূমিকম্প হবে, এ তারই সুস্পষ্ট লক্ষণ।

'সাহেব!' লারাঠা ফুঁপিয়ে উঠল, 'খোদার গজব নেমে আসছে আমাদের ওপর!'

'এখনও আসেনি। শুধু ভয়েই মরে যেতে চাও নাকি?'

লজ্জা পেল লারাঠা। ছুটল আবার।

নিচে নেমে আঁকাবাঁকা পথ ধরে দেড় মাইল একছুটে পেরিয়ে গেল ওরা। সামনে বাঁশঝাড়। একপাশে মাথার উপর হেলে পড়ে আছে পাহাড়।

বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। পঁচিশ গজ পরই ফাঁকা সৈকত।

চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে সাগর। স্পীডবোটটা দুলছে ঢেউয়ের মৃদু দোলায়। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল রানার। রেবেকার মাথার স্কার্ফ উড়ছে, দেখতে পেল ও। মুহূর্তে সুস্থির হলো মনটা।

এগিয়ে গিয়ে স্পীডবোটে উঠল রানা ছোট্ট এক লাফ দিয়ে। দু'হাঁটুর ভিতর মুখ রেখে বসে আছে রেবেকা। স্পীডবোটটা দুলে উঠতে ফুঁপিয়ে উঠল সে। পাশে বসে তার মাথায় একটা হাত রাখল রানা।

রানার স্পর্শে কেঁপে গেল রেবেকা।

'কি ঘটেছে, পরে শুনব, যদি সুযোগ হয় কোনদিন,' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল থেরাকুন, 'রানা, এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যাও তোমরা। এসো, ললিতা।'

বোট থেকে নামতে যাবে থেরাকুন, রানা তার একটা হাত ধরে ফেলল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও।

উঁচু পাহাড়। ক্রমশ উঠে গেছে। মাথার উপর চাঁদ। বাঁ দিকে আগ্নেয় পাহাড়। তার চূড়া। 'দেখতে পাচ্ছ?' বলল রানা, 'বোট থেকে নামা চলবে না তোমাদের।'

'ধোঁয়া বেরুচ্ছে না আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে, এই তো?' বলল থেরাকুন। 'আগেই দেখেছি। ভূমিকম্প হতে এখনও অনেক সময় নেবে। বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র না নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না আমরা...'

'থেরাকুন...!'

রানাকে বাধা দিয়ে থেরাকুন বলল, 'তর্ক কোরো না, রানা। নিজের বিপদটা বোঝার চেষ্টা করো। পাহাড় ভাঙবে রেড ড্রাগন তোমার খোঁজে। একটা সেকেন্ড দেরি করা উচিত হচ্ছে না তোমার।'

রেবেকা মুখ তুলল। 'ললিতা অন্তত থাকুক বোটে। আপনি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য বোটে…'

'ধন্যবাদ, রেবেকা,' ললিতা বলল। 'কিন্তু আমাকে ছাড়া কোন জিনিস ঠিক মত গুছিয়ে নিতে পারবে ও ভেবেছ? না, ভাই, তোমরা আর দেরি কোরো না…'

'তোমাদের কোন কথা শুনছি না…'

থেরাকুন গম্ভীর। 'রানা, আসলে আমি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছি। সুলতানের গ্রামে যাওয়ার আগে তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে রেবেকাকে আগলে রাখার জন্যে। তোমার আমানত রক্ষা করতে পারব, পরিস্থিতি দেখে সে আশা ত্যাগই করেছিলাম, রানা। তোমার মানুষ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, আমাকে ভারমুক্ত করো এবার। রানা, আর একটাও কথা নয়…'

'কিন্তু আপনাদের ঋণ আমরা শোধ করব কিভাবে?' থেরাকুন নেমে যাচ্ছে দেখে তীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল রেবেকা।

কোনভাবেই ঋণ শোধ করার সুযোগ নেই তোমার, রেবেকা। পাহাড়ের উপর থেকে ভাবল দাতাকু।

টাশ করে একটা শব্দ হলো। রেবেকার মাথাটা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। মুখ থুবড়ে পড়ল সে রানার কোলের উপর।

হলুদ শর্ষে ফুলের মত দেখছে রানা। রেবেকার মগজ ছড়িয়ে পড়ছে মাথার চুলে। এক সেকেন্ড পরই বুলেটের গর্তটা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিল গোটা মাথা।

রানার কোলে মুখ ঘষছে রেবেকা তখনও। যেন মুখ লুকাতে চাইছে পরম নিশ্চয়তার মধ্যে। হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে সে রানাকে। পা দুটো বোটের উপর ঘষা খাচ্ছে। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল শরীরটা।

তারপর থেমে গেল।

বাতাসে চুল উড়ছে রানার। বাঁশঝাড় দুলছে। গ্রাম থেকে ভেসে আসছে ড্রামের শব্দ। আর একটু-একটু করে পাহাড়ের মাথা থেকে সরে আসছে চাঁদ।

তিন মিনিট নড়ল না কেউ।

রেবেকার মাথাটা ধরে আছে রানা দু'হাতে। মুখ নিচু করে বসে আছে ও। অবিশ্বাসে বড় হয়ে ওঠা চোখ দুটো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। মুখ তুলল রানা।

সাগরের উপর দিয়ে বহুদূর চলে গেল দৃষ্টি। কি যেন দেখার চেষ্টা করছে ও। চোখ দুটোর চার পাশ কুঁচকে উঠল একটু। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অতীত ভেসে উঠছে চোখের সামনে। চোখ ফিরিয়ে রেবেকার দিকে তাকাল আবার। ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে রাখল বোটে। রক্তে রঞ্জিত হাত দুটো চোখের সামনে তুলল। পাঁচ সেকেন্ড পলক পড়ল না চোখে। নিঃশব্দে শিউরে উঠল

সে।

সাগরের পানিতে ডুবিয়ে হাত দুটো ধুয়ে নিল রানা। ধীরে ধীরে ঝুঁকল রেবেকার দিকে। মুখটা ঘুরিয়ে দিল একপাশে। বুজিয়ে দিল চোখের পাতা।

রেবেকার মুখের দিকে আরও কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল বোটের উপর।

অদ্ভুত শান্ত দেখাচ্ছে রানাকে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙল ললিতার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দে, যেন শুনতে পায়নি রানা, ধীরে ধীরে ঘুরল ও। এগোল।

বোট থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়াল রানা। থেরাকুনের দিকে তাকাল সরাসরি। কি বুঝল থেরাকুন, সে-ই জানে। ধীর ভঙ্গিতে মাথা কাত করল সে।

কান্না চেপে রাখার জন্যে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছে নিচের ঠোঁটটা ললিতা। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে লারাঠার সর্বশরীর।

কথা বলল না কেউ। স্টার্ট দিয়ে বোট ছেড়ে দিল থেরাকুন। পিছন ফিরে চেয়ে আছে সে রানার দিকে।

জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা যতক্ষণ দেখা গেল বোটটাকে।

নির্জন তীর। বোটের শব্দ এখন আর কানে আসছে না। একা দাঁড়িয়ে আছে রানা। হু হু বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে ওর মাথার চুল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মুখোমুখি হলো সে।

সাত

পাহাড়ের পাদদেশে কালো গম্ভীর ছায়া। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুটো দিক দেখে নিচ্ছে রানা। চারদিক স্থির, বাতাসের কাঁপনটুকু পর্যন্ত নেই।

পাহাড়ের উপর থেকে নামবে না দাতাকু, অনুমান করল ও। রেড ড্রাগনকে তারও ভয় করার সবরকম কারণ আছে।

ওয়ালথারটা বের করে চেক করে নিল। পকেটে ভরল না সেটা আর। এগোতে শুরু করল ডান দিক ধরে।

সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

পানিতে নামল রানা। সামনে বেঁকে গেছে সৈকত। বাঁকটা পেরিয়ে তীরে উঠল আবার ও।

বহুদূর বিস্তৃত তীর. নড়ি পাথরে ভর্তি। নিষ্প্রভ কালো পাথরগুলোর মধ্যে

থেকে থেকে চাঁদের আলোয় চিকচিক করে উঠছে ঝিনুকগুলো।

আরও খানিকদূর এগোবার পর দেখল তীর থেকে হঠাৎ গজ পঞ্চাশেক পিছিয়ে গেছে পাহাড়। তার রুক্ষ শরীর পেঁচিয়ে উঠে গেছে একটা পথ।

দাতাকু এই পথ দিয়েই উঠেছে যতদূর সম্ভব। মনে পড়ল, এই পথে সুলতানের গুহায় যাওয়া যায়।

দেড়শো ফিট ওঠার পরই দাতাকুকে দেখল রানা। ওর মাথার উপরের একটা কার্নিস ধরে হাঁটছে সে। চাঁদের আলোয় তার সাদা হ্যাটের কিনারাটা শুধু দেখল রানা। ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলে যাচ্ছে দাতাকু। ওয়ালথারের নল অনুসরণ করল দাতাকুর হ্যাটটাকে, যতক্ষণ দেখা গেল। কিন্তু গুলি করতে সাহস পেল না। গুলি মিস হলেই লুকিয়ে পড়বে লোকটা কোথাও, সারারাত চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।

তাছাড়া গ্রাম আর পাহাড়ের এই অংশের মাঝখানে ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। গুলির শব্দ বিস্ফোরণের মত শোনাবে এখানে। ছুটে আসবে রেড ড্রাগনরা।

কার্নিসের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল দাতাকু। দ্রুত স্মরণ করার চেষ্টা করছে রানা চওড়া কার্নিসটার মানচিত্র। দ্বীপটার দুই অংশের মাঝখানে লম্বা লাভাফিল্ড, ভেসে উঠল চোখের সামনে। কাঁটা গাছের ঝোপ পর্যন্ত অনায়াসে যাওয়া চলে, তারপর দশগজ এগোতে দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হবে। দাতাকু জানে না ব্যাপারটা? ওই পথে কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে চায় সে?

লাভাফিল্ডে পৌঁছুবার আগেই কার্নিসটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে···। ধারাল একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, মিলিয়ে গেল তখুনি।

দাতাকুর বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল এবার রানা। পঁচিশ গজ দ্রুত পেরিয়ে বাঁক নিল ও, তারপর আরও পঁচিশ গজ এগিয়ে থামল একটা কার্নিসের শেষ মাথায়।

উপরে একটা ঝুল-বারান্দা দেখা যাচ্ছে। কার্নিসটা এসে মিলেছে ওটার সঙ্গে। অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে দুটো পথ। দাতাকুকে দেখা গেল হঠাৎ ঝুল-বারান্দার কিনারায়। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে সাগরের দিকটা।

ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে রানা। কপালের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে দাতাকুর। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করার জন্যে পিস্তল ধরা হাতটা ওপরে তুলতে সাহস পেল না সে। নড়াচড়া করলেই টের পেয়ে যাবে দাতাকু।

ট্রিগার চেপে বসা তর্জনীটা নিশপিশ করছে। খুব ধীরে ওপরে তুলতে শুরু করল রানা ডান হাতটা। লক্ষ্যটা কপাল বরাবর পৌঁছবার আগেই মাথাটা সরিয়ে নিল দাতাকু।

হ্যাটটা দেখা গেল শুধু অস্পষ্টভাবে। ঝুল-বারান্দার দক্ষিণের কার্নিসটাকে বেছে নিয়েছে দাতাকু।

দ্রুত আর একবার মানচিত্রটা স্মরণ করে নিল রানা। নিশ্চিত মনে এগোল তারপর।

সোয়া এক ঘণ্টা পর খাড়া একটা প্রাচীরের মুখোমুখি হলো রানা। প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ও। দাতাকু কতদূর এগিয়েছে বোঝার কোন উপায় নেই, তবে তার আগেই পৌঁছাতে হবে ওকে।

ছোট্ট এক গর্তে পা দিয়ে প্রাচীরের খাঁজ আঁকড়ে ধরল রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল উপরে উঠতে।

একচুল নড়ার শক্তি নেই আর। কিন্তু সময় নষ্ট করাও যায় না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও।

দক্ষিণ থেকে পুবে পথটা একনাগাড়ে বেঁকে গেছে। সৈকতের ঠিক উপরে এখন রানা। দাতাকু যদি ওর বিশগজ পিছনেও থাকে, দেখতে পাবে না ওকে।

পথের শেষে প্রশস্ত ঝুল-বারান্দা। বুকে হেঁটে এগোচ্ছে রানা। চাঁদের আলো আটকে রেখেছে প্রকাণ্ড কালো একটা মেঘ। মেঘের কিনারাটা উজ্জ্বল। চাঁদ বেরিয়ে আসতে মিনিট তিন-চার লাগবে আরও, অনুমান করল ও।

ছায়ার মধ্যে কিছুই ভাল দেখছে না রানা। সুলতানের গুহা সামনেই। কোথাও অন্ধকার গাঢ়, কোথাও একটু যেন হালকা। কিন্তু কিছুই নড়ছে না।

দাতাকু কি গুহায় ঢুকে সামনে এগোবার পথ নেই দেখে ফিরে গেছে আবার? নাকি এখনও সে এসেই পৌঁছোয়নি?

ঘামছে রানা। ক্লান্তিতে ঢলে পড়তে চাইছে মাথাটা পাথরের উপর ও জানে, একটু বিশ্রাম নিতে চাইলে ঘুমিয়ে পড়বে ও নিজেরই অজান্তে।

চাঁদটা যেন ঝলসে উঠল হঠাৎ চোখের সামনে। চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল রানা।

ঝুল-বারান্দার অর্ধেকটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাকি অর্ধেকটায়, যেখানে সুলতানের গুহা, নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকার। এদিক ওদিক তাকাল রানা—বড্ড গরম!

সামান্য একটু বাতাস লাগল গায়ে। চোখ বুজে এল ওর। মাথা ঝাড়া দিয়ে এগোল অতি সন্তর্পণে।

হঠাৎ থামল রানা। মাথা আর একটু তুলতেই দেখা গেল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কূলহীন বিশাল সাগর। একটা হাহাকার অনুভব করল সে বুকের ভিতর। নেই। কিছু নেই। কেউ নেই।

বড় একটা পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। দশ মিনিট কেটে গেছে। সুলতানের গুহায় দাতাকু নেই বুঝতে পেরে সিগারেট ধরিয়েছে ও। হয় সে এখনও এসে পৌঁছায়নি, নয়তো এসে ফিরে গেছে।

ফিরে গিয়ে থাকলে আবার তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কঠিন,

অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। দুর্গম পাহাড়ের কোথায় সে আশ্রয় নিয়েছে, কে জানে! রাতের মধ্যেই খুঁজে বের করতে হবে দাতাকুকে যেমন করে হোক।

রেড ড্রাগনের হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। সকাল হওয়ার আগেই কায়দানা ছেড়ে যেতে হবে ওকে। রেড ড্রাগনের নাগালের বাইরে একবার যেতে পারলেই হয়, ওদের অস্তিত্ব বিলোপের ব্যবস্থা করবে ও। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হবে রেড ড্রাগনকে, মিত্রা সেনের উচ্চাভিলাষী স্বপ্নেরও সমাপ্তি ঘটবে সেই সাথে।

শেষ টান দিয়ে নিভিয়ে ফেলল রানা সিগারেটটা। ঠিক দু'মিনিট পর ছোট্ট একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পেল ও। ওপাশ থেকে উঠে আসছে দাতাকু সুলতানের গুহার উদ্দেশে।

চাঁদের আলোয় হ্যাটের ছায়া পড়ল ঝুল-বারান্দার ওপর। ঝিক করে উঠল একটা পিস্তলের নল। পরমুহূর্তে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ওকে। এগিয়ে যাচ্ছে সোজা গুহামুখের দিকে।

'দাতাকু!' ডাকল রানা। পিস্তলটা তাক করাই রয়েছে, কিন্তু অসতর্ক শত্রুর পিঠে গুলি করতে বাধল ওর। চাইল নাম ধরে ডেকে নিজের দিকে ফেরাবে ওকে।

'টাশ্‌শ!' জবাব এল পিস্তলের মুখ থেকে। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করল দাতাকু। পরমুহূর্তে এক লাফে চলে গেল ছায়ায়, গুহামুখের সামনে। তারপর সাঁৎ করে ঢুকে গেল গুহার মধ্যে।

বাম কাঁধের কাছে শার্টটা ভিজে উঠছে, টের পেল রানা। কাঁধের আধ ইঞ্চি মাংস ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়েছে রানাকে—গুলি করবার সুযোগই পায়নি সে।

দাঁতে দাঁত ঘষল একবার রানা। বসে পড়ল পাথরের আড়ালে। বন্দী এখন দাতাকু, তাহলেও অপেক্ষা করতে হবে রাতটুকু। দিনের আলোয় পরিষ্কার হয়ে যাবে গুহার ভেতরটা, তখন সহজ লক্ষ্যে পরিণত হবে সে। কিন্তু সে সময় কি পাওয়া যাবে?

দূরে অনেকগুলো আলোর বিন্দু চোখে পড়ল রানার। রেড ড্রাগন। গুলির আওয়াজ পেয়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে।

রানা জানে, দাতাকু নামের পশুটাকে মরতে হবে আজ। কিন্তু দাতাকু কি জানে? সে কি গুহা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে? সেই চেষ্টার অর্থ তো মৃত্যু। তার জন্যেই অপেক্ষা করছে রানা।

পাহাড়ের ধার ধরে উঠে আসছে এখন আলোকবিন্দুগুলো।

আট

বাতাসের স্পন্দন টের পাচ্ছে না রানা। অসহ্য গরম লাগছে ওর। দরদর করে ঘামছে সারা শরীর। কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না—শুধুই কি বাতাস নেই বলে? নাকি, কোনরকম অসুস্থতা পেয়ে বসল ওকে?

দূর! কি সব আবোল তাবোল ভাবছে ও! আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করল নিজেকে রানা। কিছুই না, আসলে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন ঘামছে ও। তাছাড়া, বাতাসও যেন ষড়যন্ত্র করছে।

অন্যদিকে মন ফেরাবার প্রয়াস পেল রানা। দাতাকু। এখন সে গুহার ভিতর কি করছে? খুঁজছে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ? জেনে ফেলেছে: এই রাতটুকুর মধ্যে যদি বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে পরিণাম কি হবে? না জানার কথা নয়। ধরা পড়ে গেছে সে, এখন মরিয়া হয়ে করতে চাইবে একটা কিছু।

গুহার ভেতরে একটা মাত্র জানালা, তার নিচে কয়েকশো ফিট শূন্যতা। ও পথে নয়, দাতাকু যদি পালাতে চায় এই গুহামুখ দিয়েই বেরোতে হবে তাকে।

কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একটা প্রসঙ্গই ফিরে আসছে ওর মনে: সুস্থ বোধ করছি না কেন?

শরীরটার হলো কি? ক্রমে ছোট হয়ে আসছে নিঃশ্বাসগুলো। মাথার ভিতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা। বমি বমি ভাব আসছে। ঢোক গিলল পরপর দু'বার, কিন্তু শুকনো জিভে কোন সাড়া পেল না রানা।

নিঃশব্দে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে চাঁদ। নিচে ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে সৈকতের বালি।

সামনের পাথরটায় হাত রেখে তাতে মাথা রাখল রানা। হঠাৎ ভাবল, নিজেকে এভাবে ভীষণ পরিশ্রান্ত ভাবা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু হাতের পেশীতে জোর পেল না রানা। মাথাটা তুলতে গিয়ে ওর মনে হলো, কে যেন ঘাড় চেপে ধরে রেখেছে ওর, পাথর থেকে তুলতেই পারছে না।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা। পরমুহূর্তে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা ঝাঁকাতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিয়ে এগোল ও। পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। গুহামুখের দিকে দৃষ্টি। ওয়ালথার ধরা হাতটা মরা সাপের মত ঝুলছে পাশে।

তিন পা সামনে এগোতেই কাঁপুনি ধরল ওকে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মত ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল শরীর। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ও কিসের শব্দ? হঠাৎ চোখ বড় বড় করল রানা। কোথাও বিদঘুটে একটা শব্দ হলো বলে মনে হলো ওর। শুকনো গলায় কাশল যেন কেউ। দাতাকু?

ভুলটা ভাঙল আবার সেই একই শব্দ হতে। দাতাকুর নয়, শব্দটা ওর নিজের গলার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে।

প্রচণ্ড শীত করছে রানার। দাঁতে দাঁত বাড়ি লাগছে।

চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল রানার। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও। হাঁপাচ্ছে। কি হলো ওর!

কখন শুয়ে পড়েছে রানা জানে না নিজেই। যখন বুঝল, আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরের উপর দিয়ে। দাতাকু যদি টের পায়…!

হড় হড় করে বমি করে ফেলল রানা। বমি করার শব্দ গুহার ভিতর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে বুঝতে পেরেও কিছু করার নেই ওর। মাথাটা তুলতে গিয়েও পারল না। হঠাৎ অসহায়, একা অনুভব করল ও নিজেকে। মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ওকে। শেষবার কি খেয়েছে মনে করার চেষ্টা করল।

মিত্রার বৈঠকখানায় হুইস্কি খেয়েছিল, কিন্তু খাবার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। এত সময় পেরিয়ে যাবার পর কোন বিষের প্রতিক্রিয়া…নাহ্!

নাকি ডাক্তার মেহফুজের কথাই ঠিক। তিনি যে বলেছিলেন, হঠাৎ কোলাপস করার সময় ওর এসে গেছে। কোন আগাম নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ করে হাল ছেড়ে দেবে ও, আঙুল নাড়বারও শক্তি পাবে না বিপদের মুহূর্তে। ডাক্তারের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই কি সত্য হতে চলেছে? সত্যিই কি তাহলে ও অযোগ্য হয়ে পড়েছে? দাতাকুর জন্যে ফাঁদ পেতে নিজেই অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল সে, আর এখন এই অবস্থা। ঠিকই বলেছিল ডাক্তার মেহফুজ? ওকে বিদায় দিয়ে ঠিকই করেছিলেন মেজর জেনারেল?

কোনরকমে মাথা তুলল রানা। কিন্তু তুলে রাখতে পারল না। পড়ে গেল সেটা আবার পাথরের উপর ঠক করে। চিৎকার করে সাহায্য চাইবার ইচ্ছা জাগল একবার। প্রাণ নিয়ে এখন টানাটানি শুরু করেছে অসুস্থতা।

মিনিট তিনেক নিঃশব্দে পড়ে রইল রানা। কাঁপুনিটা একটু যেন কমেছে বলে মনে হলো। ওয়ালথারটা নেই হাতে। ভাবল, পড়ে গেছে হাত থেকে। এদিক ওদিক হাতড়াল সেটার খোঁজে। নেই।

মাথা তুলল ধীরে ধীরে রানা। ওয়ালথারটা মাথার সামনে পড়ে রয়েছে দেখে ধরল সেটা। উঠে বসল। গুহার দিকে তাকাতে দেখল চাঁদের আলো দরজা ছুঁয়েছে। ভিতরটার কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এখনও অন্ধকারে ঢাকা।

দূর থেকে রেড ড্রাগনের অস্পষ্ট হৈচৈ আর ফাঁকা গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না। আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সারতে

হবে কাজটা। সামনের একটা বড় পাথরের আড়ালে পৌঁছে গুলি করবে ও। দাতাকুও গুলি করবে নিশ্চয়ই। সেই আলোর রশ্মি দেখে লক্ষ্যস্থির করতে হবে। কাজটা সেরে নিচে নেমে যেতে হবে ওকে। ভাবছে রানা। বাঁশঝাড়ের ভিতর নিশ্চয়ই একটা স্পীডবোট রেখে গেছে এতক্ষণে খেরাকুন। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে হয়তো সাহায্য পাওয়া যাবে অল্পক্ষণের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি করা দরকার। শরীরের উপর ভরসা করতে পারছে না ও। যে-কোন মুহূর্তে অচল করে দিতে পারে ওকে রহস্যময় এই অসুস্থতা।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। কিন্তু তিন হাত গিয়েই আক্রান্ত হলো আবার।

থামাতে চেষ্টা করল কাঁপুনিটা, তাতে বেড়ে গেল যেন আরও দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার শব্দ। ওয়ালথার ধরা হাতটা চোখের সামনে তুলল রানা। অবিশ্বাসে বড় হয়ে উঠল চোখ দুটো। এমন অসম্ভব কাঁপছে যে তিন হাত দূরের লক্ষ্যস্থলেও গুলি লাগাতে পারবে না।

গুলি লাগাতে পারবে না! কথাটা মনে হতেই অসুস্থতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইল। বসে বসেই টলছে রানা। গলার ভিতর থেকে গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মুখ বুজতে চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু এমন হাঁপাচ্ছে যে মুখ খুলে যাচ্ছে আপনা থেকেই, নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে কণ্ঠ চিরে। দরদর অবিরাম ঘামছে সে।

কিছু নেই জেনেও কিছু ধরার জন্যে সামনের দিকে হাত বাড়াল ও। একজন অন্ধ মানুষ যেন অপরিচিত জায়গায় নিজের চারদিকের অবস্থা জানার চেষ্টা করছে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে রানার। কোন্ দিকে গুহামুখ, ভুলে গেছে এরই মধ্যে। গলার ভিতর থেকে উঠে আসা শব্দগুলোকে কোনমতে থামাতে পারছে না।

ঠিক তখুনি চাঁদের আলোয় দেখল রানা দাতাকুকে। গুহামুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে।

এগোচ্ছে সামনের পাথরটার দিকে আড়ালের উদ্দেশে।

শুয়ে পড়েছিল, উঠে বসল রানা। ওয়ালথার ধরা হাতটা তুলল। কিন্তু হাতের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল ও, কারও হাত এমন কাঁপতে পারে?

গুলি করল রানা। নাকি, কাঁপুনির ফলে ট্রিগারে চাপ পড়ায় বেরিয়ে গেছে গুলি? জানতে পারল না রানা। বুলেটটা দাতাকুর তিন হাত দূর দিয়ে ছুটে গেছে। পরের গুলিটা গুহার ভিতর ছুটে গিয়ে ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলল। আবার লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে রানা। তর্জনী দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিতে চাইছে সে। কিন্তু আঙুলটা অসাড় হয়ে গেছে।

কিছু করার নেই আর। দাতাকু বুঝে ফেলেছে: রানা এখন সত্যিই অসহায়।

কাছে চলে এসেছে দাতাকু। এখন একদম সামনে। আধবোজা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে রানা, দু'হাত সামনে দুটো পা দাঁড়িয়ে আছে।

শার্টের কলার ধরে রানাকে বসাল দাতাকু। ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করল রানা। কিন্তু একটা পেশী নড়ল না একচুলও। তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা পাঁজরে। লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল পাথরের উপর।

আবার শার্টের কলার চেপে ধরে টেনে তুলল ওকে দাতাকু। দাঁড় করাল। ছেড়ে দিতেই টলতে লাগল রানা মাতালের মত।

পড়ে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এসে লাথি মারল দাতাকু রানার কোমরে।

এইভাবে বারবার। গুহার ভিতর দেড় ঘণ্টা মৃত্যু ভয়ে যে কষ্ট পেয়েছে দাতাকু, তার শোধ সুদে আসলে তুলে নেয়ার জন্যেই যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সে।

তখনও জ্ঞান হারায়নি রানা। চোখ দুটো শেষবার যখন বুজল, গুহার ভিতর দরজার কাছে পড়ে আছে সে। ওর বুকের উপর দাঁড়িয়ে হাসছে দাতাকু।

তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

নয়

দশ মিনিট পর পুরো জ্ঞান ফিরল রানার। সজাগ হয়েই অনুভব করল কাঁপুনিটা একেবারেই নেই আর। ঘামছেও না বা শীতও করছে না ওর। শুধু একটা ক্লান্তির ভাব অনুভব করছে ও শরীরে। প্রচণ্ড মারের ফলে সারা শরীরে ব্যথা।

চোখ মেলল রানা। মাথা তুলল। হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

শব্দ করে হেসে উঠল দাতাকু। পাথরের একটা তাকে বসে আছে সে। কাঁধটা সুলতানের জানালার কাছে। চাঁদের আলো পড়ায় জানালার কার্নিসে দেখা যাচ্ছে ওর ওয়ালথারটা।

ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিল রানা। বড় করে শ্বাস নিয়ে বাতাস ভরল বুকে। জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে, অনুভব করল গায়ে। সেই মুহূর্তে অসুস্থতার রহস্যময় কারণটা আবিষ্কার করল ও। ঝুল-বারান্দার সমতল মেঝেতে অসংখ্য চিকন ফাটল আছে। সেই ফাটল দিয়ে সালফারের বাষ্প ওঠে সারাক্ষণ। হালকা হলদেটে বাষ্প, অন্ধকারে দেখতে পায়নি ও। বাতাস থাকলে বাষ্প উড়ে চলে যায়। কিন্তু বাতাস না থাকলে জমাট হয়ে থাকে

চারদিকে। শ্বাসের সাথে ফুসফুসে অনেকক্ষণ ধরে ঢুকে ওরকম অসুস্থ করে ফেলেছিল ওকে।

'হ্যাঁ, গুহার ভেতর তোমাকে টেনে এনেছি—কারণ এখানেই থাকতে হবে তোমার।' একটা সিগারেট ধরাল দাতাকু, 'তোমাকে আমি মারতে পারি না, রানা—কারণ, তুমি জানো, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ঘৃণা নিয়ে আক্রোশ নিয়েই বাঁচতে হবে আমার,' পা বাড়িয়ে রানাকে ধাক্কা দিল একবার, 'তার জন্যে তোমাকে আমার দরকার!'

ধাক্কা খাওয়ার সময় ইচ্ছে করেই একটু বেশি দুলে উঠল রানা, ওই ফাঁকেই চাপ দিল জুতোর গোড়ালিতে। লুকোনো ছুরিটা বেরিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

'তা তোমাকে আমি বাঁচাতাম—ইচ্ছেটা ছিল বুঝতেই পারছ। রেবেকাকে গুলি করার পর আরেকটা গুলি আমি খরচ করতে পারতাম।' দাতাকু বলে চলল, 'হাতের টিপটা আমার খারাপ নয়—রুবেনের কথাটা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে এখন, না?'

আস্তে আস্তে পা টানছে রানা। ভান করছে যেন অসুস্থতাটা এখনও যায়নি ওর, হাঁপাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস টানছে। পায়ের বাঁধনটা ইতোমধ্যে আলগা হয়ে গেছে, খসে পড়ে যাচ্ছে দড়িটা।

'অসুখ হয়েছে তোমার—এতেই মারা পড়বে, নইলে এখানে এই গুহার ভেতর না খেতে পেয়ে মরবে শুকিয়ে। খুব কষ্ট হবে, তাই না?' এগিয়ে এসে রানার বুকের ওপর পা তুলে দিল দাতাকু, 'কিন্তু সেই কষ্ট লাঘবের ক্ষমতা আমার নেই, আছে রেড ড্রাগনদের। ওরা আসছে, এখানে যদি এসে পড়ে তাহলে আর বেশিক্ষণ এই কষ্টটা থাকবে না তোমার। আমাকে চলে যেতে হচ্ছে এজন্যেই, সিগারেটটা শেষ হলেই আমি বেরিয়ে পড়ব।'

কিছুক্ষণ থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ কানে আসছিল রানার, এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। ড্রামের শব্দ। সেই সঙ্গে কিছু শোরগোল। ফাঁকা গুলির আওয়াজও হলো কয়েকটা। বেশ কাছে এসে পড়েছে ওরা!

কষে একটা গালি দিতে চাইল রানা দাতাকুকে, যাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসে আঘাত করতে। কিন্তু আরও আঘাত কি সইতে পারবে ওর শরীর? গুহার সামনে দাতাকুর যথেচ্ছ আঘাতে সর্বাঙ্গ টনটন করছে যন্ত্রণায়, পাঁজরের কাছে যেখানে অসহ্য একটা বেদনা সেখানেই পা রেখেছে দাতাকু। গালির বদলে অস্ফুট একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল রানার কণ্ঠ চিরে।

'এরপরও যদি কোনভাবে বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারো—দেখা হবে। আমার নজর এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না।' বলেই সজোরে লাথি মারল দাতাকু।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে রানা প্রায় ছিটকে পড়ল দূরে। ধনুকের মত বাঁকা

হয়ে গেল ওর শরীরটা, তারপর কুণ্ডলী পাকিয়ে নেতিয়ে পড়ল। হাত দুটো চলে এসেছে ওর পায়ের কাছে।

বাইরে পর-পর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। আরও কাছে চলে আসছে রেড ড্রাগনের দল। ড্রামের দ্রিম দ্রাম এখন আরও স্পষ্ট।

অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে রানা। মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে গোঙানির মত একটা শব্দ।

একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল দাতাকু, দ্রুত কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, তারপর ফেলে দিল। 'এসে পড়েছে প্রায়—কাজেই বিদায়, রানা!'

বেরিয়ে যাচ্ছে দাতাকু। চাঁদের আলো গুহার ভেতর প্রবেশ করেছে অনেকখানি, দাতাকুর হাতে ধরা কোল্টের নলটা সেই আলোয় একবার চকচক করে উঠল।

'দাতাকু!'

জ্বলন্ত ক্রোধে অমানুষিক শোনাল রানার চিৎকার।

ঘাড় ফেরাবার সময় পেল না দাতাকু, তার আগেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বলির খাঁড়ার মত কারাতের একটা কোপ। সেই সঙ্গে ডান পা দিয়ে দাতাকুর কব্জিতে লাথি মারল রানা, ছিটকে কোথায় চলে গেল কোল্টটা।

গুহামুখের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল দাতাকু। বুকটা আছাড় খেল শক্ত পাথরের সাথে। দমাদম কয়েকটা লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল সে। উঠে বসতে যাবে, রানা একটা পা ধরে ফেলল তার। তারপর পিছিয়ে আসতে লাগল। দাতাকুর পেট, বুক ঘষা খাচ্ছে পাথরের সাথে। পাথর ধরে থামার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু জায়গাটা নিপাট সমতল, ধরার কিছু নেই।

ঝুল-বারান্দার কিনারার দিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা বুঝতে পেরে হঠাৎ যেন নবজীবন ফিরে এল দাতাকুর শরীরে। মরিয়া হয়ে সাপের মত মোচড় দিয়ে উঠল প্রচণ্ড বেগে। সেই সাথে ল্যাঙ মারল রানার পায়ে। ছিটকে তিন হাত দূরে পড়ল রানা। চোখের পলকে একটা পাথর তুলে নিল দাতাকু।

উঠে বসার চেষ্টা করছে রানা। কাছে পৌঁছে ওর মাথা লক্ষ্য করে পাথর ধরা হাত দুটো বিদ্যুদ্বেগে নামিয়ে আনল দাতাকু।

মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল রানা এক সেকেন্ড আগে। ঘাড়ের উপর পড়ল পাথরটা। গড়িয়ে চলে গেল পিছনে।

বসেই রইল রানা। কিন্তু তীব্র যন্ত্রণায় অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনেটা। অনুভব করল, দাতাকু ওকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। তিন সেকেন্ড পর চোখের সামনে আলো ফুটল আবার। শুইয়ে দিয়েছে ওকে দাতাকু, বুকের ওপর চেপে বসে দুই হাতে টিপে ধরেছে গলা, ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে ওর চোখেমুখে।

কণ্ঠনালীর ওপর ক্রমেই চেপে বসছে দাতাকুর আঙুলগুলো। জিভ

বেরিয়ে এসেছে রানার, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

ডান হাতটা শরীরের নিচে চাপা পড়ে আছে ওর—প্রাণপণ চেষ্টায় সামান্য কাত হয়ে হাতটা মুক্ত করে নিল রানা। তারপর দাতাকু কিছু বুঝে ওঠার আগেই চট্ করে দুই হাতে চেপে ধরল ওর দু'হাতের কড়ে আঙুল দুটো। জোরে একটা ঝট্কা দিতেই মড়াৎ করে ভেঙে গেল আঙুল দুটো।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল দাতাকু। রানার কণ্ঠনালী থেকে ছুটে গেছে হাত, অবাক হয়ে দেখছে নিজের ভাঙা আঙুল দুটো।

দড়াম করে ঘুষি পড়ল নাকের উপর। অন্ধকার হয়ে গেল চোখ। দরদর করে পানি নামছে নাক-চোখ দিয়ে। শুয়ে শুয়েই রদ্দা চালাল রানা ওর ঘাড়ের পাশে। টলে উঠল, কিন্তু বুকের ওপর থেকে নামল না ভারী শরীরটা।

এইবার পিছন থেকে পা দুটো দাতাকুর মাথার ওপর দিয়ে ভাঁজ করে এনে বুকে বাধাল রানা। কি ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে পেরেই ভয়ার্ত এক চিৎকার বেরিয়ে এল দাতাকুর কণ্ঠনালী চিরে।

প্রচণ্ড বেগে পা দুটো নিচের দিকে নামাল রানা। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল দাতাকুর শরীরটা রানার বুকের ওপর থেকে। ঝুল-বারান্দার কিনার থেকে দুই ফুট দূরে পাথর খামচে ধরে গতিরোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বিস্ফারিত দুই চোখে তীব্র আতঙ্ক। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে মৃত্যুভয়ে। চিৎকার করে উঠল আবার দাতাকু। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিচের দিকে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে আর্ত চিৎকারটা।

স্খলিত পায়ে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। টলছে। ক্লান্ত, অসম্ভব ক্লান্ত ও।

যে পথে উপরে উঠেছিল সেই পথেই নেমে এসেছে সে নিচে রেড ড্রাগনদের চোখ এড়িয়ে।

সামনেই সমুদ্র, বাঁশঝাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু। পশ্চিম আকাশে চাঁদটা এখন তার আলো গুটিয়ে নিয়েছে, ফ্যাকাসে ম্লান একটা ছায়া কিছুক্ষণের জন্যে নেমে এসেছে চারপাশে—একটু পরেই ফুটতে শুরু করবে ভোরের আলো।

বাঁশঝাড় শেষ হয়ে আসতেই স্পীডবোটটা চোখে পড়ল রানার। দুলছে ঢেউয়ের দোলায়।

বোটে উঠে বসল রানা। ছেড়ে দিল বোট। একটি বারও ঘাড় ফিরিয়ে চাইল না সে কায়ুদানার দিকে। দ্বীপটিকে কিছুতেই মনে রাখতে চায় না রানা।

ভুলে যেতে চায়।

* * *